লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭০ বর্ষ ■ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ আশ্বিন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ■ ১৭ রমযান, ১৪২৮ হিজরি

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ ঈসাব্দ

খিলাফতে আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮ লগো

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

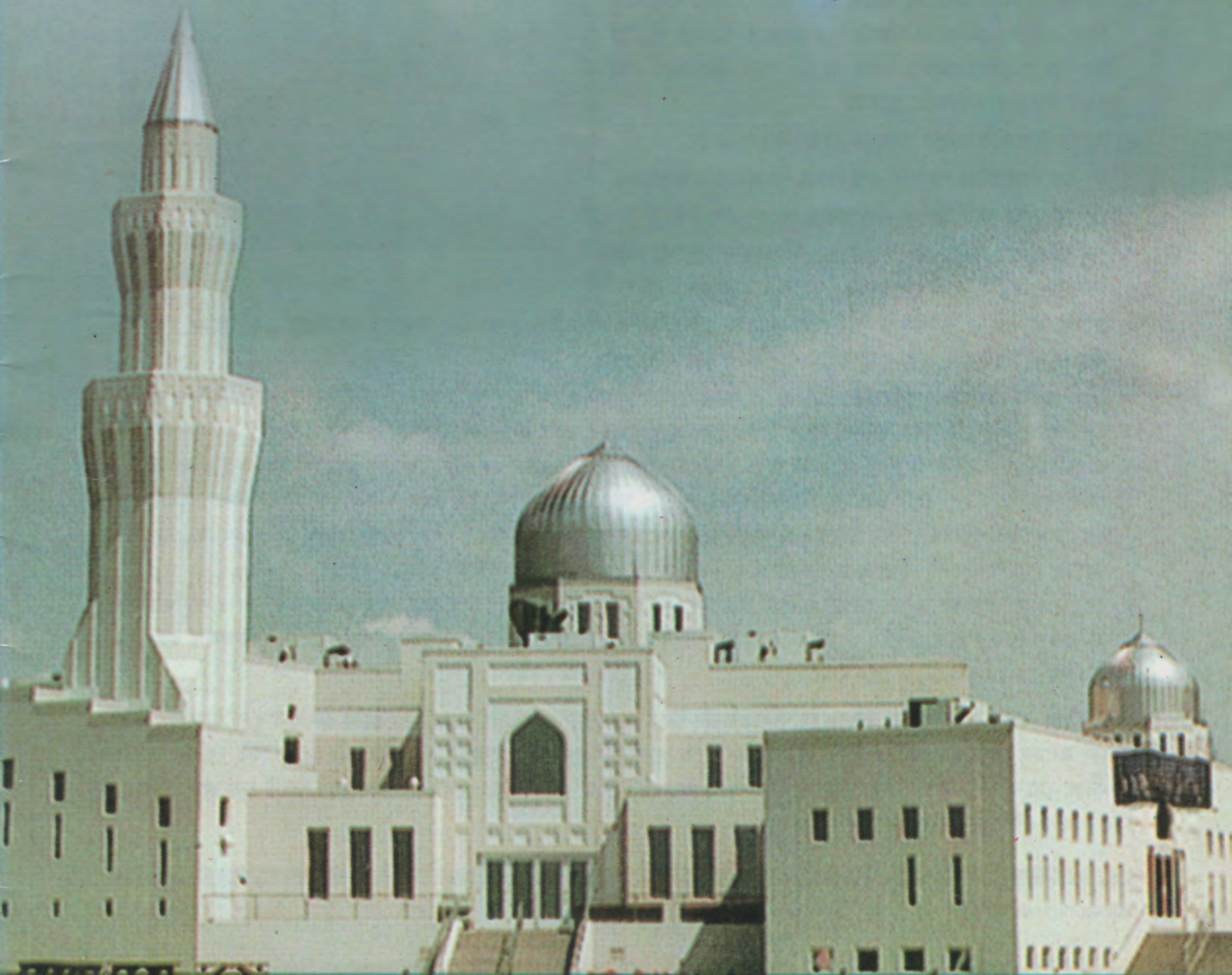

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর'আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

ডাঃ ২০. উদ্দিন আহমদ
নিজামুদ্দিন আহমদ আহমদীয়া মুসলিম জামাত

সম্পাদকীয়

শাহ্‌রু রামাযানাল্লাযি উনযিলা ফিহিল কুরআন .....

রমাযান হলো সে মাস যাতে কুরআন অবতীর্ন করা হয়েছে.....

পবিত্র কুরআন যাবতীয় কল্যানের উৎস । কাজেই এ উৎসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে এ পবিত্র মাসে আমাদের সকলের তৎপর হতে হবে। যা আমরা সাধন করতে পারি নিয়মিত কুরআন করীম তিলাওয়াত করে অর্থ শিখে আর এর তফসীর ও নিগুঢ় গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করে।

সৌন্দর্যময় কুরআনের উজ্জল প্রভা নিজ মাঝে ধারন করার অনুশীলনে এই একটি মাস আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার বর্জন, রতি ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা সহ নির্দিষ্ট কিছু বিধি-নিষেধ, যা বছরের অন্যান্য সময় বিধিসম্মত বলে পরিগণিত হতো তাও পরিহার করে চলতে হয়। এটা এ কারনে যে সঙ্গত দৈহিক চাহিদা গুলো থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করে আত্মার চাহিদা কামনায় মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

এটা মায়ের আবেগময় স্নেহের পরশ পেতে শিশু নিজেই মাটিতে আছড়ে পড়ার মত, নইলে মহান আল্লাহ তাআলার করুণা তো সর্বদাই আমাদের ছেয়ে রয়েছে।

সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহে মা যতটা উম্মুখ আল্লাহতাআলা তো তার চেয়েও স্নেহপরায়ণ। তাই মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র রমযানে বান্দার ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন 'ফা ইন্নি কারীব ....' (আল বাকারা ঃ ১৮৭) অর্থাৎ আমি কাছেই আছি ' তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পেয়ে যায়।

এ কল্যাণ লাভে তৎপর হতে আমাদের জানানো হয়েছে রমযানের প্রথম দশক রহমতের, আল্লাহ তাআলার কৃপা আকর্ষণের। দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের অনুশোচনার অনুতাপে পাপ মোচনের আর তৃতীয় দশক নাজাতের বা মুক্তিলাভের অর্থাৎ পার্থিব জগতের সবকিছু থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে খোদামিলনের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হওয়ার। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, রমযানে বান্দার যে প্রতিদান প্রাপ্তি ঘটবে তা আমি স্বয়ং।

অতএব সুপ্রিয় পাঠক! পবিত্র রমযানে খোদা মিলনের পরম তৃপ্তি ও স্বস্তি লাভ হউক আপনাদের সবার এটাই আমাদের সবিশেষ কামনা।

ঈদ মোবারক

পবিত্র রমযানের পর খোদা মিলনের স্বাদ নিয়ে ঈদ-উল-ফিতর-এর সুখ ও আনন্দ মু'মেনের জীবন ভরিয়ে দেয়। আনন্দের এ দিনকে স্থায়ী রূপ দিতে আমরা যেন আমাদের বিত্তহীন স্বজনদের কথা না ভুলি এজন্যই বুঝি এটাকে বলা হয়েছে ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের নামায আদায়ের পর পরস্পর কোলাকোলি করে, ভিত্তশালী - বিত্তবান, অগ্রবর্তী আর পশ্চাতে অবস্থানকারীরা যেমন বুকে-বুকে একত্রে মিলিত হয়ে যায়- ঈদ উৎসব। আমাদেরকে সেই সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও ভালবাসাকে সমাজে ব্যাপকতর বিস্তৃতিদানের শিক্ষাই দেয়।

তাই আসুন, সমাজে এই মহান শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে আমরা ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রবর্তিত 'ঈদ ফান্ড'-এ আর্থিক কুরবানী পেশ করে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করি। আবারও সকলকে **'ঈদ মোবারক ও ঈদের শুভেচ্ছা'**।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭

সূচীপত্র — পৃষ্ঠা নং

- **কুরআন শরীফ** — ৪
- **হাদীস শরীফ** — ৫
- **অমৃতবাণী** — ৬
- **জুমআর খুতবা ঃ ইদানিং যে সব ঝড়ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্প পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে এগুলো হলো সতর্ক সংকেত।**
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) — ৭-১২
- **ঈদ-উল-ফিতরের খুতবা**
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) — ১৩-১৪
- **সিয়াম সাধনা একটি ইবাদত** — ১৫-২৩
  আলহাজ্জ্ব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- **প্রত্যহ কুরআন পাঠের ফযিলত** — ২৪-২৫
  ডা. পারভীন হাকিম আনোয়ার
- **হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবনাদর্শের এক ঝলক** — ২৬-২৭
  মিসেস মাহমুদা ইসলাম
- **"তরবীয়তে আওলাদ"** — ২৮-৩০
  সন্তানদের উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকাই মূখ্য
  মিসেস মিসামাতুন নেসা
- **সুরভিত এক ফুল-মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ (রাহেঃ)** — ৩১-৩২
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **সতর্ক হওয়ার সময় কি এখনও আসে নাই!** — ৩৩-৩৪
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়** — ৩৫-৩৬
- **সংবাদ** — ৩৭-৪২
- **স্বাস্থ্য পাতা** — ৪৩-৪৪
  গ্রন্থনা ঃ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ
- **আশ্বিন মাসের কৃষি** — ৪৫-৪৬

প্রচ্ছদ: বাইতুল ইসলাম মসজিদ, ম্যাপল, অন্টারিও, কানাডা

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾

৬৬। আর তাদের কথা যেন[১২৭৫] তোমাকে মর্মাহত না করে। নিশ্চয় সব সম্মান প্রতিপত্তি আল্লাহ্‌রই আয়ত্তে। তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭। শুন! আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সব) আল্লাহ্‌রই। আর যারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শরীকদের ডাকে তারা (প্রকৃতপক্ষে) এদের অনুসরণ করে না। তারা কেবল (নিজেদের) ধ্যান-ধারণারই অনুসরণ করে। আর তারা কেবল অনুমানের ভিত্তিতে চলে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এতে বিশ্রাম করতে পার ও দিনকে করেছেন আলোকময়[১২৭৬]। নিশ্চয় এতে সেসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা (কথা মনোযোগ দিয়ে) শোনে।

১২৭৫। ৬৩নং আয়াতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ্‌র বন্ধুগণ (আওলিয়া) কখনো শোকাভিভূত হবে না বা হয় না, কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ)-কে শোক করতে বা মর্মাহত হতে বারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সাঃ)-এর মর্মাহত হওয়াটা তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং অন্যদের জন্য ছিল। তিনি মানবজাতির জন্য ক্রন্দন করতেন এবং শোকাভিভূত হতেন। ১৬৬৪ টীকা দ্রষ্টব্য

১২৭৬। রাত্রি যেমন কঠিন পরিশ্রমে মানুষের শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুনঃ সজীব করবার সময় দিয়ে থাকে এবং আগামী দিনের জন্য তাকে কর্মক্ষম করে তোলে, সেইরূপ জাতিসমূহের জীবনেও নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম অবস্থার বিরতি তাদের অবকাশ বা বিশ্রাম এবং সক্ষমতা দানের কাজ করে থাকে এবং তাদের মধ্যে নূতন জীবনীশক্তি এবং নূতন উদ্যম-প্রেরণা ঢেলে দিয়ে প্রাণবন্ত করে ফেলে এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

হাদীস শরীফ

রোযা, এ'তেকাফ এবং লায়লাতুল কদর

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, মানুষের প্রত্যেকটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান স্বরূপ হব। অর্থাৎ বান্দার রোযার বিনিময়ে তাকে আমি আমার দিদার (দর্শন) দান করব। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ রোযা ঢাল স্বরূপ। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় থাকে, তার উচিত, সে যেন বাজে কথা, হট্টগোল এবং খারাপ কাজ হতে দূরে থাকে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয় তখন সে যেন জবাব দেয়, আমি রোযায় আছি। কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর জান রয়েছে। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তাআলার কাছে মৃগনাভী হতেও সুগন্ধিযুক্ত। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে প্রথম, সে সময় যখন রোযাদার ইফতার করে। দ্বিতীয়, যেদিন সে তার রোযার ফলে খোদার দীদার বা দর্শন লাভ করবে। (বুখারী)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রোযা থাকা অবস্থায় মিথ্যা কথা থেকে এবং মিথ্যা (খারাপ) আমল থেকে বিরত থাকে না, আল্লাহ্ তাআলার নিকট তার এই ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থাকার কোন মূল্য নাই–অর্থাৎ তার রোযা রাখা বৃথা"।

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ "যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দুয়ার সমূহ খুলে দেয়া হয় ও দোযখের দুয়ার সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বেড়ী পরানো হয়" (বুখারী)।

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফে বসতেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরূপ করে গিয়েছেন। তাঁর পরে তাঁর সাহাবীরাও (রাঃ) এ'তেকাফে বসে ছিলেন।

(৫) হযরত ইব্নে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কয়েকজন সাহাবী (রাঃ)-কে স্বপ্নে লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে দেখান হলে রসূল করীম (সাঃ) বললেন, আমি দেখছি তোমাদের স্বপ্ন রমযানের শেষ সপ্তাহের উপর ঐক্যমত। অতঃপর যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর-এর অনুসন্ধান করতে চায়, সে যেন তা রমযানের শেষ সপ্তাহে অনুসন্ধান করে। (বুখারী)

(হাদীকাতুল সালেহীন গ্রন্থ হতে সংকলিত ও অনুদিত)

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আল্লাহ্‌র হেফাজতের গুপ্ত রহস্য

"যার অন্তর এই কথায় আনন্দিত যে, রমযান এসেছে এবং সে এই প্রতীক্ষায় ছিল যে রোযা রাখবে অথচ অসুস্থতার জন্য রোযা রাখতে পারে না, এরূপ ব্যক্তি আকাশে রোযা থেকে বঞ্চিত হবে না। দুনিয়ার অনেক লোক ওজর খুঁজে এবং ভাবে যে, দুনিয়ার মানুষকে আমি যে ধোকা দিচ্ছি, সে ভাবে খোদাকেও ধোকা দিচ্ছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ থেকে বাহানা গড়ে নেয় এবং ওজরগুলোকে শামিল করে বাহানাগুলোকে সহি সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার কাছে সেগুলো সহি নয়। ওজরের দ্বার বহু বিস্তৃত। মানুষ চাইলে এতদ্বারা সারা জীবন বসে নামায পড়তে পারে এবং রোযা একেবারেই না রাখতে পারে। কিন্তু খোদা তার নিয়ত ও ভাবধারা সম্পর্কে অবগত। যার সততা এবং আন্তরিকতা আছে, খোদা জানেন যে, তার অন্তরের মধ্যে দরদ রয়েছে। খোদা তাকে আসল পুণ্য হতে অধিক দান করেন। কারণ সমবেদনা মর্যাদার বস্তু। বাহানাকারী ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট এই ভরসার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোযা রেখেছিলাম তখন নবীগণের এক দলের সাথে আমি কাশফে মিলিত হই। তাঁরা বললেন তুমি নিজের আত্মাকে কেন এত কষ্টে ফেলেছ। এরূপ যখন মানুষ খোদার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলে তখন তিনি স্বয়ং পিতা-মাতার ন্যায় তাকে তা থেকে বের করে সকরুণে বলেন যে, কেন তুমি কষ্টে পড়েছ কিন্তু যে ওজর করে নিজেকে কষ্ট হতে বাঁচায়, খোদা তাকে অন্যান্য কষ্টে ফেলেন এবং তা থেকে তাকে বের করেন না। পক্ষান্তরে যে নিজেকে কষ্টে ফেলে, তাকে তিনি স্বয়ং বের করে আনেন। মানুষের কর্তব্য সে যেন নিজ আত্মার উপর স্বয়ং অনুগ্রহ না করে বরং খোদা তার আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ করেন। মানুষের নিজ আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ, তার জন্য জাহান্নাম সদৃশ। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার বিষয় চিন্তা কর।

যে ব্যক্তি নিজে আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়, তাকে খোদা এসে আগুন থেকে বাঁচান এবং যে স্বয়ং আগুন হতে বাঁচতে চায়, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। এতে পুর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে এবং এটাই ইসলাম যে, যা কিছু খোদার রাস্তায় আসে, তাকে অস্বীকার করো না। যদি আঁ হযরত (সাঃ) নিজ মাহাত্মের চিন্তায় নিমগ্ন হতেন তা হলে **'আল্লাহু ইয়া'ছিমুকা মিনান নাস'** অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন–এ আয়াত নাযেল হত না। আল্লাহ্‌র হেফাযতের এটাই গুপ্ত রহস্য। (আল হাকাম, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯০২ ইং পৃষ্ঠা ৯)

অনুবাদ: **মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ**

জড়জগতের মোহ ও বস্তুবাদিতায় এরা এত বেশী মত্ত, যার কারণে এরা কেবল যে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা-ই নয় বরং এরা ধর্মের প্রতি কটাক্ষকারীতে পরিণত হচ্ছে , এরা পবিত্র নবী-রসূলের প্রতি বিদ্রুপকারীতে পরিণত হচ্ছে। আবার এমন এক শ্রেণীও আছে, যারা আল-াহ তা'লার মহান অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত নয় বরং তাঁকে নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপে লিপ্ত।

ইদানিং যে সব ঝড়ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্প পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে এগুলো হলো সতর্ক-সংকেত। অর্থাৎ, সীমালঙ্ঘনকারীরা এগুলোতে আক্রান্ত ও জর্জরিত হতে পারে। প্রাথমিক ও নিম্ন পর্যায়ের এসব দুর্যোগ চরম আকারও ধারণ করতে পারে।

প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, একদিকে সে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করবে, অপরদিকে জগতবাসীকেও জানাবে, এসব বিপদ ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার একটাই পথ। আর তা হলো, তোমরা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে সনাক্ত কর এবং তাঁর প্রিয়দের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না।

হল্যান্ডের এক রাজনৈতিক নেতার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং কুরআন মজীদ-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের যথোপযুক্ত উত্তর। এক্ষেত্রে ইসলামের মনোরম শিক্ষা সুশীল ও ন্যায়পরায়ন লোকদের কাছে পৌঁছাতে আহমদীদেরকে তাগীদপূর্ণ নির্দেশনা।

সাইয়্যেদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা তারিখ ঃ ২৪ আগষ্ট, ২০০৭ইং, ২৪ যহুর, ১৩৮৬ হিজরী শামসী। স্থান ঃ নানস্পীট-হল্যান্ড

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العامين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد و اياك نستعين.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين

افامن الذين مكرو السيات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون (النحل: ٤٦)

[আশ্‌হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন আর্ রহ্‌মানির রাহীম মালিকি ইয়াওমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন ইহদিনাস্‌সিরাতাল মুস্তাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আ'লাইহীম গাইরিল মাগযুবি আলাইহীম ওয়ালায্ যোয়াল্লীন। (আমীন)

আফা আমেনাল্লাযীনা মাকারুস্ সায়্যেআতে আইয়্যাখসেফাল্লাহু বিহিমুল্ আরযা আও ইয়া'তিয়া হুমুল্ আযাবু মিন হায়সু লা ইয়াশ্‌উ'রুন}। (সূরা আন্ নাহ্‌ল আয়াত-৪৬)

বস্তুবাদিতা ও জড়জগতের মোহের কারণে মানুষ আজ বেশ কয়েকটি চারিত্রিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে। সে ধর্ম ও খোদা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। যে সব জিনিষ ও উপকরণ দ্বারা মানুষ উপকৃত হচ্ছে সেসব যে মহান আল্লাহর সৃষ্টি, আর এগুলোকে তিনি যে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের অধীনস্থ করে রেখেছেন, আবার সৃষ্টির সেরা হিসেবে তিনি মানুষকে যে উত্তম মন মস্তিষ্ক প্রদান করেছেন তা কাজে লাগিয়ে সে যে নিত্য নতুন আবিস্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিজ সাচ্ছন্দ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে চলেছে- অতি অল্প সংখ্যক মানুষই একথা উপলব্ধি করে। এটা এমন একটি বিষয় যা মানুষকে খোদার প্রতি আরও কৃতজ্ঞ বানানোর কথা, নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে আরও সচেতন করার কথা। অর্থাৎ সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসনার ক্ষেত্রে তার আরও তৎপর হবার কথা যিনি এসব নেয়ামত তাকে দান করেছেন আর এসব ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে মানব সেবায় নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু আমি একটু আগেই বলেছি, খুব কম সংখ্যক মানুষই এই সত্যটি উপলব্ধি করেন। যারা এ সত্যটি অনুধাবন করেন না এদের সংখ্যা বরং দিন দিন বাড়ছে। কেবল এরা যে অনুধাবনই করেন না তাই নয় বরং এরা এই মহা পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। জড়জগতের মোহ ও বস্তুবাদিতায় এরা এত বেশী মত্ত, যার কারণে এরা কেবল যে ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা-ই নয় বরং এরা ধর্মের প্রতি কটাক্ষকারীতে পরিণত হচ্ছে, এরা পবিত্র নবী-রসূলের প্রতি বিদ্রুপকারীতে পরিণত হচ্ছে। আবার এমন এক শ্রেণীও আছে, যারা আল্লাহ্ তা'লার মহান অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত নয় বরং তাঁকে নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রুপে লিপ্ত। খোদার মহান অস্তিত্ব অস্বীকার করে বই-পুস্তক লেখা হয় আর এসব পুস্তক Best Sellers হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে আর জনপ্রিয় বই-পুস্তক হিসেবে এগুলো খ্যাতি লাভ করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় খোদা-বিমুখ, এধরণের বাজে সাহিত্য রচনাকারী ও এগুলোকে উপভোগকারী উভয় ধরণের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসব মানুষ একদিক থেকে অপারগও বটে। কেননা, এদের ধর্মবিশ্বাস এদেরকে হৃদয়ের প্রশান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমস্ত শক্তির উৎস আর সকল সৃষ্টির একক স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে এরা যেহেতু দিশেহারা হয়ে একাধিক খোদার বিশ্বাস লালন করে ফেলেছে, দোয়ার দর্শন বা দোয়ার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে এরা যেক্ষেত্রে অনবহিত আর জীবন্ত খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ, তখন স্বভাবতই এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আমরা দাবী করছি ধর্মচর্চার কিন্তু কিছুই অর্জন করতে পারছি না- এদের চিন্তাশীল মস্তিষ্কগুলো এ কথা ভেবে ধর্ম ও খোদার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতায় ভুগে। এর কারণ হলো, এরা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে ভুলে বসেছে। এই বিষয়টিই এদেরকে ধর্ম-বিমুখ করে তুলেছে। আমি একটু আগেই বলেছি, এরা খোদার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে। কেবল অস্বীকার করাই নয় বরং এরা আল্লাহর মহান অস্তিত্বের প্রতি কটাক্ষ সূচক ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্যও রেখে চলেছে।

আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষনের ক্ষেত্রে এত অগ্রসর যার কারণে এরা পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নব নবরূপে আক্রমন করতে সচেষ্ট। কুরআন শরীফ ও মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি এরা এমন সব কথা বা শিক্ষা আরোপ করে থাকে যার সাথে কুরআনী শিক্ষার বা মহানবী (সাঃ)-এর আচরণের দূরতম সম্পর্ক নেই। যাই হোক, এই ধরণের মানুষ আর পূর্বে উল্লেখিত শ্রেণীর মানুষ, উভয় প্রকার মানুষই খোদা-বিমুখ আর খোদার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী। এরা সমালোচনার লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পবিত্র ইসলাম ও মুসলমানদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, এরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে, ধর্ম বা খোদাতা'লার পবিত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক শিক্ষা যদি কোন ধর্মে থেকে থাকে তবে তা একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে, পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এক শ্রেণীর পক্ষ থেকে এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত বেশী মাত্রায় প্রকাশিত হতে দেখে ভাবতেও অবাক লাগে, এ যুগে, বাহ্যত সুশিক্ষিত জাতিসমূহে, যারা নিজেদেরকে উন্নত আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারক-বাহক বলে দাবী করে, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে বিশ্বাসী–এমন সব পশ্চিমা দেশে কীভাবে এসব মানুষ শালীনতার সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং ইসলাম-বিদ্বেষ এদেরকে কীভাবে অন্ধ করে দিয়েছে!

কিছুদিন আগে এদেশের (অর্থাৎ Holland-এর) একজন রাজনৈতিক নেতা যার নাম Geert Wilders (উচ্চারণ সম্ভবত: খিরাত উইলডারয) একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন। এই বক্তব্যে তিনি তার অন্তরের সুপ্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে ফেলেছেন। এই ব্যক্তির প্রলাপ এখানে উপস্থিত অনেকেই শুনে থাকবেন। বিশ্ববাসীও জানুক তিনি কী বলেছেন। তিনি লিখেছেন, **আমি চাই, মানুষ নিজেরা যাচাই করে দেখুক।** (হুযুর বলেন) এধরণের লোকের এটা এক প্রকার ধোকাবাজী। এরপর Geert Wilders বলছেন, **বিষয়টির সূচনা মুহাম্মদ** (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) **থেকে হয়েছে। বেশীরভাগ মুসলমান তাঁকে যেমন প্রেমময় ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন প্রকৃতপক্ষে তিনি এমনটি ছিলেন না। তিনি যতদিন মক্কায় ছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকালে কুরআনের অল্প অংশই অবতীর্ণ হয়েছিল, ততদিন তার মাঝে কিছুটা ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আর বিশেষ করে মদীনায় বসবাসকালে তার মাঝে ক্রমান্বয়ে কঠোরতা ও উগ্রতা সৃষ্টি হতে থাকে।** (নাউযুবিল্লাহ)।

এরপর তিনি লিখেছেন, **নয় (৯) নম্বর সূরার পাঁচ (৫) নম্বর আয়াতে আপনারা লক্ষ্য করবেন কীভাবে খৃষ্টান, ইহুদী ও মুরতাদ্‌দের বিরুদ্ধে কঠোর হবার জন্য উস্কানী প্রদান করা হয়েছে। বেশীরভাগ আয়াত স্ববিরোধীতায় পূর্ণ।** এরপর তিনি বাইবেলের প্রশংসা করেছেন। যাই হোক, এটি একটি পৃথক বিষয়। আমি এখনকার মত সেদিকে যাচ্ছি না। এরপর তিনি লিখেছেন, **কুরআনে রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে পৃথক রাখার কোন নীতি নেই। মুহাম্মদ** (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) **যে একজন উগ্র মানুষ ছিলেন** (নাউযুবিল্লাহ) **একথা অস্বীকার করার জো নেই বরং কুরআন নিজেও উগ্র শিক্ষা-সম্বলিত এক গ্রন্থ।**

আবার আরেক পত্রিকায় এ ব্যক্তি লিখেছেন, **আমি খোদার উপাসনা করার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছি।** পত্রিকায় বিবৃতিতে Geert Wilders **কেবল কুরআনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করারই দাবী করেন নি বরং তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেও সন্ত্রাসী মুসলমানদেরকে এদেশে আশ্রয় দিচ্ছেন বলে কঠোর সমালোচনা করেন।** অর্থাৎ এই অজ্ঞ ব্যক্তি সবাইকে এক পাল্লায় মাপছেন।

তিনি আরও বলেছেন, **আমি ইসলামের প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। এখন মুসলমানদের কেউ যেন দেশত্যাগ করে এখানে না আসে। আমি হল্যান্ডে আল্লাহ্‌র উপাসনা করার কথা শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে গেছি। আমি হল্যান্ডে কুরআনের উল্লেখ শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে পড়েছি।** (নাউযুবিল্লাহ) **এই ফ্যাসিষ্ট গ্রন্থের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা উচিত।** অথচ ফ্যাসিজমের বহিঃপ্রকাশ এই ব্যক্তি নিজেই করছেন!

লক্ষ্য করুন, মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে **তার প্রথম অভিযোগ হলো,** তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর মাঝে উগ্রতা সৃষ্টি হতে থাকে। এ কথা বলা বাহুল্য, বিদ্বেষ ও ঘৃণা এই ব্যক্তিকে এমন অন্ধ করে দিয়েছে যার কারণে তিনি পবিত্র কুরআন পড়ে দেখার কষ্টটাও করেন নি। অবশ্য, এ ধরণের মানুষ কুরআন এমনিতেও পড়ে না বরং শোনা কথা বলে বেড়ায়। তবে কুরআন শরীফ পড়ার সৌভাগ্য না হলেও ইনি ইতিহাসকে কিন্তু ঠিকই বিকৃত করছেন। এর চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী যে সব খৃষ্টান পন্ডিত ছিলেন তারা আজ পর্যন্ত যে সব অপবাদ দিতে পারেন নি ইনি সেই অপবাদও দিয়ে বসেছেন। জানি না, কোথা থেকে এসব অভিযোগ এরা খুঁজে বের করেছেন। সূরা মায়েদা যে কেবল মদীনায় অবতীর্ণ সূরা তাই নয় বরং সংশ্লিষ্ট সব বর্ণনা একথা সাব্যস্ত করে, এই সূরাটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনের শেষ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরায় পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘাত নিরসনের আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার কী চমৎকার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে! এই ব্যক্তি বলেছেন, মদীনায় এসে উগ্র শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ۝

অবতীর্ণ শেষ সূরার শিক্ষা কি? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,
(উচ্চারণঃ **ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানা'নু কাওমিন আ'লা আল্লা তা'দেলূ ই'দেলূ হুওয়া আক্বরাবু লিত্ তাক্বওয়া**) (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৯) অর্থাৎ "কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অন্যায়-অবিচারে প্ররোচিত না করে। বরং তোমরা ন্যায় বিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর আচরণ"। এবার এ ব্যক্তি দেখাক্, এমন সুন্দর শিক্ষা তার নিজের বা অন্য কোন ধর্মে আছে কি? কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা যাদেরকে অন্ধ করে দেয়, তারা চোখের সামনে রাখা জিনিষও দেখতে পায়না। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, যারা অন্ধ তাদেরকে তোমরা কীভাবে পথ দেখাবে? তাদেরকে আলোর দিশা তোমরা কীভাবে দিবে? তোমরা চেষ্টা করে দেখ, কিন্তু তাদেরকে পথ দেখাতে পারবে না।

এরপর এই ব্যক্তি বলেছেন, সূরা তওবার পাঁচ নম্বর আয়াতে খৃষ্টান, ইহুদী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে উগ্রতা প্রদর্শনের উস্কানী প্রদান করা হয়েছে। এরা যদি নিজেদের দৃষ্টির সামনে থেকে বিদ্বেষের আবরন সরিয়ে বিষয়টি দেখে, কুরআন শরীফকে এরা যদি স্বচ্ছ হৃদয় নিয়ে পড়ে দেখে তাহলে এরা নিজেরাই দেখতে পাবে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা কেবল সেসব মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছেন যারা কোনক্রমেই ক্ষান্ত হয় না, কোন ধরণের শান্তি-চুক্তি করে না আর দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ায়। যেহেতু এখন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তাই আদেশ দেয়া হয়েছে (রাষ্ট্রদ্রোহী) এমন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কেননা, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা আর যুদ্ধের আগুন ছড়াচ্ছে। তারা বিভিন্ন গোত্রকে তোমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে। এই ব্যক্তির অপবাদ অনুযায়ী সবাইকে হত্যা করার শিক্ষাও দেয়া হয়নি। বরং এদেরকে গ্রেফতার করার আদেশও আছে। বলা হয়েছে, এদেরকে বন্দী কর, এদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখো যেন এরা দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলার আগুন না ছড়ায়। Geert Wilders সাহেবের মতে যদি এমতাবস্থায়ও (দেশদ্রোহীদের) পূর্ণ স্বাধীণতা দেয়া সমীচীন হয়ে থাকে, যদি তার মতে দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর অনুমতি সবার থেকে থাকে তাহলে তিনি যেন নিজ দেশের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সমস্ত অপরাধীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার লক্ষে, যাচ্ছেতাই করে বেড়ানোর অধিকার দিয়ে আইন প্রণয়ন করেন। সেক্ষেত্রে এই অপরাধীরা কিন্তু কোন একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী হবেন না। প্রত্যেক জাতি ও ধর্মানুসারীদের মাঝেই অপরাধী রয়েছে। তা না হলে বলুন, এখন আপনারা এমন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কেন উঠে পড়ে লেগেছেন যারা দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছেন, যারা দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

পরিশেষে, তিনি তার বিদ্বেষ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যার কারণে প্রতীয়মান হয় এই ব্যক্তির অবস্থান খোদা তা'লার বিপক্ষে, ইসলাম পরিবেশিত জীবন্ত ও এক-অদ্বিতীয় খোদার বিরুদ্ধে। কেননা, তিনি দেখতে পাচ্ছেন, এটাই একমাত্র ধর্ম যা যুক্তি ও দলিল বলে সবাইকে নির্বাক করে দেয়। তাই এক্ষেত্রে যুক্তি প্রমান দিয়ে কাজ হবে না- এগুলো এমনিতেই এদের কাছে নেই। সেজন্য দেশে আইন প্রণয়ন করে বল-প্রয়োগ করতে হবে, তবেই কাজ হবে। এটাই পরাভূত পক্ষের লক্ষণ। নিজেদের আচরণের মাধ্যমে হেরে গেছেন বলে এরা নিজেরাই স্বীকার করে নিচ্ছেন।

হল্যান্ডে কিছুদিন পর পর ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ইস্যু সৃষ্টি হয়ে থাকে, বিষোদগার করা হয়ে থাকে। মহিলাদের হিজাব বা পর্দার বিরুদ্ধেও এখানে ইস্যু সৃষ্টি করা হয়েছিল আবার অন্য বিষয়েও ইস্যু সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু গোটা ডাচ (Dutch) জাতিই যে এরকম তা কিন্তু নয়। এদের মাঝে ভদ্র ও সুশীল মানুষ আছেন, নেতা-নেত্রীদের মাঝেও ভাল মানুষ আছেন, বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ভাল ভাল মানুষ আছেন। কুরআন শরীফ ও মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এ ব্যক্তি যে কটুক্তি করেছে, এরা এর বিপক্ষে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের নাম Helbc Zeilstra (উচ্চারণ সম্ভবতঃ হালবে যায়েল সাতরা)। এই সংসদ সদস্য তাকে (অর্থাৎ Geert Wilders-কে) সম্বোধন করে বলেন, *ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করার কোন অধিকার আপনার নেই।* আবার Jeroen Dijselbloem (উচ্চারণ সম্ভবতঃ ইয়ারাউন দাইসেল ব্লোম) বলেন, *Wilders তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। হল্যান্ডে আপনি যে কোন ধর্ম-বিশ্বাসই পোষন করতে পারেন।* আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা (যিনি নিজেও সংসদ সদস্য) বলেছেন, *সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে। Wilders-কে 'রেসিষ্ট' বা বর্ণবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিত।* আবার আরেকজন আইনজীবি যিনি পূর্বে কনসেলরেরও দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বাদী হয়ে Wilders-এর বিরুদ্ধে পুলিশে মামলা দায়ের করেছেন। একজন নারী-নেত্রীও তার এই কুটুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরেকজন বলেছেন, *বই-পত্র ও প্রকাশনার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের সূচনা।* এখানকার কেবিনেট (অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদ)-ও Wilders-এর বিবৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তারা বলেন, *এধরণের বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে হল্যান্ডে বসবাসরত মুসলমানদের একটি বৃহদাংশের অবমাননা করা হয়েছে।* পররাষ্ট্র মন্ত্রীও বলেছেন, *হল্যান্ডে কুরআনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করার কোন পরিকল্পনা নেই।* যাই হোক, এখানে এরকম ভদ্র সুশীল লোকেরাও আছেন আবার ঐ ধরণের মানুষও আছে।

প্রত্যেক আহমদীর আবশ্যক দায়িত্ব হলো, একদিকে আপনারা যেন অভিযোগকারীদের আপত্তি খন্ডন করেন, তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের যেন যথাযথ উত্তর দেন, অন্যদিকে আপনারা যেন এসব ভদ্র ও সুশীল মানুষদেরকে ধন্যবাদও জানান যারা এখনও শিষ্টাচার ও ভদ্রতার মূল্যবোধ রাখেন। এদের কাছে ইসলাম ধর্মের হৃদয়গ্রাহী শিক্ষাগুলোকে তুলে ধরুন। এদের মাঝে যে বা যারা পূণ্যবান স্বভাববিশিষ্ট ও ন্যায়-নীতির অনুসারী তাঁদেরকে আল্লাহ তা'লার মহান বাণী পৌঁছে দিন। আজ বিশ্বে চতুর্দিকে যে অস্থিরতা বিরাজমান এর প্রকৃত কারণ এদের কাছে ব্যক্ত করুন। তাদেরকে বলুন, এর প্রকৃত কারণ হলো, তোমরা খোদা তা'লাকে পরিত্যাগ করেছো। তোমরা তোমাদের একক স্রষ্টা খোদাকে চেনার চেষ্টা কর। এদের কাছে এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী পৌঁছে দিন। এদেরকে বলুন, মনের তৃপ্তি ও আত্মিক প্রশান্তি এসব জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও আমোদ-প্রমোদের মাঝে নিহিত নয়, নেশা ও Drug-এর মাঝে নিহিত নয়, (মনের প্রশান্তি অর্জনের লক্ষ্যে এখানকার মানুষ খুব বেশী মাদক ও নেশা জাতীয় জিনিষ সেবন করে। এরা সব ধরণের বাজে নেশা করে থাকে)। এদেরকে বলুন, প্রকৃত প্রশান্তি খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হবার মাঝে নিহিত। তাই তোমরা সেই এক-অদ্বিতীয় খোদাকে চেনার চেষ্টা কর যিনি সমস্ত শক্তির অধিকারী। যারা সীমালঙ্ঘনকারী, ধর্ম-বিমুখ, ধর্মের প্রতি, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্রুপকারী তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আল্লাহ তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে এক পর্যায়ে গিয়ে ধরে গিয়ে শাস্তি দেন। WILDERS-এর মত মানুষদেরও বলুন, আল্লাহর আযাবকে আমন্ত্রন জানিও না। তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত করো না।

ইদানিং যে সব ঝড়ঝঞ্ঝা ও ভূমিকম্প পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে **এগুলো হলো সতর্ক-সংকেত। অর্থাৎ, সীমালঙ্ঘনকারীরা এগুলোতে আক্রান্ত ও জর্জরিত হতে পারে। বিশ্বের কোন দেশ নিরাপদ নয়, জগতের কোন মানুষ এ থেকে নিরাপদ নয়।** এমনিতেই হল্যান্ড এমন একটা দেশ যার বেশীরভাগ অংশ বাঁধ দিয়ে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ঝড়ঝঞ্ঝা আঘাত হানলে তা পৃথিবীর পাহাড় ও উচ্চ ভূমিকেও নিস্তার দেয় না–সেক্ষেত্রে এটা যে এক সমতলভূমি মাত্র! বরং এর অনেক স্থান সমুদ্র স্তরেরও নীচে! ১৯৫৩ সালে এখানে ঝড় হয়েছিল। সেটি বড় ধরণের ক্ষতিসাধন করেছিল। এরপর এখানকার অধিবাসীরা ও সরকার মিলে বড় ধরণের একটা প্রকল্প হাতে নেয়। তদনুযায়ী নদীর মোহনায় সমুদ্র উপকূলে অনেকগুলো বাঁধ বেধে দেয়া হয়, ড্যাম নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন স্থানে এ প্রকল্প কার্যকর করা হয়েছে। একে Delta Works বলা হয়। আমি নিজেও এই প্রকল্প দেখে এসেছি। নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম মানবীয় প্রচেষ্টা। কিন্তু বিশ্বে বর্তমানে যে সব ঝড় হচ্ছে- কোন দেশই এ থেকে নিরাপদ নয়। আমাদেরকে সেখানে যে গাইড ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল সে একপর্যায়ে আমাকে বললো, এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের জন্য হল্যান্ডকে সুরক্ষিত করে ফেলেছি। আমি তাকে বললাম, একথা বল, সুরক্ষিত করবার

যতটুকু চেষ্টা করা যায় আমরা তা করেছি। তা না হলে একমাত্র আল্লাহ্ জানেন তোমরা কতদিনের জন্য একে সুরক্ষিত করেছো আর কতদিন এই নিরাপত্তা কার্যকর থাকবে। সে বললো, একবারে সঠিক কথা। এরপর যতক্ষণ সে আমাকে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল বার বার একথাই বলছিল, এটা একটা মানবীয় প্রচেষ্টা মাত্র। কেননা এ ধরণের প্রলয়ঙ্করী ঝড় সাধারণতঃ দ'শ বছরের ব্যবধানে হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ই ভাল জানেন, সেই ঝড় প্রকৃতপক্ষে কখন আসবে আর এ প্রকল্প কতটুকু নিরাপদ থাকবে। যাইহোক, এ সময় সে যখনই আমাকে ব্যাখ্যা দিচ্ছিল কমপক্ষে চার পাঁচবার সে খোদার ইশ্বরত্ব স্বীকার করে বলেছিল, হ্যাঁ! একমাত্র আল্লাহ্ সুরক্ষা করলেই আমরা নিরাপদ থাকতে পারি। **অতএব, এদেশে এমন মানুষ আছে যাদেরকে বুঝিয়ে বললে এক-অদ্বিতীয় খোদার বিষয়টি এদের হৃদয়পটে তাৎক্ষনিক জাগ্রত হয়।** আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মানুষ বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়লে আমাকেই স্মরণ করে, তখন অন্য কোন খোদার নাম মনে পড়ে না। সে আমাকে পরিদর্শন বইয়ে নিজের অনুভূতি লিখে দিয়ে স্বাক্ষর দিতে বলে। আমি একথাই লিখেছি: এটা একটা উত্তম মানবীয় প্রচেষ্টা আর প্রচেষ্টা হিসেবে এটা একটা বিস্ময়কর প্রকল্প যা দেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রকৌশলীরা নির্মান করেছেন। কিন্তু সর্বক্ষন স্মরণ রাখা উচিত, প্রকৃত পরিকল্পনার মালিক হলেন আল্লাহ্ তা'লা। সত্যিকারের সুরক্ষা লাভের জন্য সারাক্ষণ আল্লাহ্কে স্মরণ রাখা উচিত।

যাইহোক, আজকাল বিশ্ববাসী যে বস্তুবাদিতায় মত্ত হয়ে আছে, এর কোন নির্দিষ্ট গন্ডি নেই। পাশ্চাত্যও একইভাবে নিমগ্ন যেভাবে প্রাচ্যবাসীরা নিমগ্ন। সবাই খোদাকে ভুলে বসেছে। আবার এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা এক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে আর এভাবে তারা আল্লাহর ক্রোধকে উস্কে দিচ্ছে। **এরা খোদাকে যে ভুলে বসেছে তাই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা সম্বন্ধে এরা বাজে কথাও বলে বেড়ায়। এসব অপরাধ আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ ও ঐশী শাস্তিকে আহ্বান জানানোর নামান্তর!!**

অতএব প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য, প্রত্যেক দেশে আপনারা আপনাদের স্কন্ধে অর্পিত বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব যথাযথভাবে পূর্ণ করুন। ইসলাম ধর্মের সঠিক পরিচয় জগতের সামনে উপস্থাপন করুন। খৃষ্টানদেরকেও দেখান, ইহুদীদেরকে এবং ধর্মহীনদেরকেও দেখান। আর মুসলমানদেরকেও পথ দেখান যারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে অস্বীকার করছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, **"আমার আবির্ভাব না ঘটলে এসব বিপদের আগমনে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে খোদা তা'লার ক্রোধ প্রকাশের সেই সুপ্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে যা দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল।"** (হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২শ খন্ড, পৃঃ ২৬৮)।

গত ১০০ বছরের ঘটনাবলী যাচাই করে দেখুন। এ শতাব্দীতে যতগুলো ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা গেছে সেটা অতীতের বহু শতাব্দীর সমন্বিত সংখ্যার চেয়ে বেশী। বিগত এগার বার'শ বছরে এত দুর্যোগ দেখা যায় নি যত দুর্যোগ গত ১০০ বছরে দেখা দিয়েছে। চলতি বছরেও কয়েকটি ভূমিকম্প ও ঝড়ঝঞ্ঝা হয়েছে আর তা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। এটা মানুষের জন্য একটা সতর্ক-সংকেত: **তোমরা খোদাকে সনাক্ত কর!!** প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, একদিকে সে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করবে অপরদিকে জগতবাসীকেও জানাবে, এসব বিপদ ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার একটাই পথ। আর তা হলো, **তোমরা এক-অদ্বিতীয় খোদাকে সনাক্ত কর এবং তাঁর প্রিয়দের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না।**

সারা বিশ্বে চলতি বছরের কয়েক মাসে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে এর একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে কোন না কোন দুর্যোগের প্রাদূর্ভাব এভাবে কখনও হয়নি। কিন্তু এবছর আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রত্যেক অঞ্চলে এভাবে বিপদ দেখা দিয়েছে। এদেরকে বলুন, এখনও সময় আছে মানুষ যেন তার খোদাকে সনাক্ত করে। প্রাথমিক ও নিম্ন পর্যায়ের এসব দুর্যোগ চরম আকারও ধারণ করতে পারে।

অতএব, প্রত্যেক আহমদী যেন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী খোদার বাণী প্রচারে মগ্ন হয়। আমি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি এগুলো সম্পূর্ণ খতিয়ান কি না বলতে পারবো না। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এবছর ফেব্রুয়ারীতে ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা দেখা দেয়, তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়ে। আবার দু'বার ভূমিকম্প দেখা দেয় রিক্টার স্কেলে যার মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৬.৪ এবং ৬.৩। আবার সুমাত্রা দ্বীপে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছে। এরপর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ Solomon Islands-এ ভূমিকম্প হয়েছে। এটি এক প্রচন্ড ভূমিকম্প ছিল যা প্রচুর ধ্বংসলীলা সাধন করে, এতে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৮.১। এরপর পাকিস্তানে হঠাৎ বন্যা হয়। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন করাচীতে বন্যা দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা হয়, অনেকে মৃত্যুবরণ করে। বলা হয়, এতে বেলুচিস্তান প্রদেশের ২৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮০ হাজার ঘর-বাড়ী ধ্বংস হয়েছে আর ছয় (৬) হাজার গ্রাম বিনষ্ট হয়েছে। পুনরায় জুন মাসে পাকিস্তানে সাইক্লোন (Cyclone)-এর আশঙ্কা দেখা দেয়। সেটা সরাসরি আঘাত না হেনে বেলুচিস্তানে আঘাত হানে এবং সেখানে ধ্বংসলীলা সাধন করে। আবার জুন মাসে বাংলাদেশে বড় ধরণের একটা ঝড় হয় যাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এরপর ভারতে জুলাই মাসে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়। আবার জুলাইয়ে

যুক্তরাজ্যে বন্যা দেখা দেয়। আর অর্ধেক ইউকে পানিতে তলিয়ে যায়। এর আগে যে বন্যা হয়েছিল তাতে জার্মানী ও অন্যান্য অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এরপর পাকিস্তানে বজ্রপাতের দরুন অনেক বড় ক্ষতি সাধিত হয়। আবার জাপানে ভূমিকম্প হয় যার তীব্রতা রিক্টর স্কেলে ৬.৮ ছিল। এরপর আগষ্টে আমেরিকায় সামুদ্রিক ঝড় আঘাত হানে, অনেক বাড়ী-ঘর ধ্বংস হয়, ব্যাপক ক্ষতি হয়। চীনে ঝড়ের কারণে একটি ব্রীজ ভেঙ্গে পড়ে আর অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। উত্তর কোরিয়ায় অতিবৃষ্টি ও প্লাবন দরুন অনেক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। কয়েকদিন আগে পেরুতে (দক্ষিন আমেরিকা) বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়। সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরপর পাকিস্তানে পুনরায় বন্যা দেখা দেয়। - অতএব এসব ঘটনাপ্রবাহ যেগুলো আমি সংক্ষেপে বললাম এগুলো আমাদেরকে সাবধান করছে। আবার অষ্ট্রেলিয়ায় এমন বড় ঝড় হয় যার ফলশ্রুতিতে মহাসড়কগুলো ডুবে যায় বরং ভেসে যায়। এমন ঘটনা তাদের ধারনার বাইরে ছিল। এরপর বরকিনা ফাসো (পশ্চিম আফ্রিকা) দেশে কিছুদিন পূর্বে অতিবৃষ্টির দরুন মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে, দু'লাখ মানুষ সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আবার হাওয়াই (Hawai) দ্বীপপুঞ্জে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে আর একই সাথে ভূমিকম্পও দেখা দিয়েছে। অথচ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এ ধরনের ঝড় ও ভূমিকম্পের সম্ভাবনা খুব কম বলে বলা হয়ে থাকে। আবার আরব সাগরে সামুদ্রিক ঝড় দেখা দেয়। বলা হয়, অন্যান্য সমুদ্রে এ ধরনের ঝড় হলেও আরব সাগরে কখনও হয় না। এই ঝড় স্থলভাগেও Tropical Cyclone আকারে আঘাত হানতে পারতো। Albama State-এ ঝড় হয়েছে। আগাম সর্তক করে দেয়ার পর এরা অনেক প্রস্তুতি নিয়েছিল, তবুও এটা অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। বলা হয়েছে, এখানে একটি স্কুল ভবনে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। ঝড়ের কবলে পড়ে সেই ভবনটি ভেঙ্গে যায়। এরা বেরিয়ে আরেকটি ভবনে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সেটাও ধ্বংস হয়ে যায়। একই ভাবে অন্য অনেক বাড়ী-ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মানুষ যেখানেই আশ্রয় নেয়, এই ঘূর্ণিঝড় (Tornado) সেখানেই আঘাত হেনে বাড়ী-ঘর উড়িয়ে নিয়ে গেছে। একইভাবে দক্ষিন আফ্রিকাতেও বড় ধরণের ঝড় হয়েছে। এসব ঘটনাপ্রবাহ ও দুর্যোগ আমাদেরকে সতর্ক করছে, **আল্লাহ্ তা'লার তকদীর কার্যকর, আর এসব হলো মানুষের জন্য সতর্ক-সংকেত: তোমরা তোমাদের এক-অদ্বিতীয় খোদাকে অনুসন্ধান কর আর সীমালঙ্ঘন করো না, নবী-রসূল ও স্বয়ং খোদার বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না।**

আমি খুতবার প্রারম্ভে আজকে যে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেছি এতেও আল-াহ্ একথাই বলছেন। এ আয়াতের অনুবাদ হলো, **যারা কুচক্র করেছে আল্লাহ্ যে তাদেরকে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে বিলীন করে দেবেন না অথবা তাদের কাছে যে তাদের ধারণাতীত কোন পথ দিয়ে আযাব আসবে না- এ বিষয়ে এরা কি নিশ্চিত?** অতএব আল-াহ তা'লা বলছেন, কুচক্রে রত মানুষ আল্লাহর সামনে টিকতে পারবে না। যখন এরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলে তখন আল্লাহ তা'লার শাস্তির যাঁতাকল ঘুরতে আরম্ভ করে। তাই বাহ্যতঃ স্বল্প মাত্রার ঘূর্ণিঝড় আর ভূমিকম্প যা এ বছর একাধারে বিশ্বে দেখা দিয়েছে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পাশ্চাত্যের অধিবাসী, প্রাচ্যে বসবাসকারী এবং সব ধর্মের অনুসারী-সবারই এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। মুসলমানদেরও আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও উপলব্ধি করা উচিত। ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ্‌র ক্রোধ আজ কেন সক্রিয়? একজন **'আহবানকারীর'** ঐশী **'আহবানের'** প্রতি মনোযোগ দিন। তিনি বলেছেন, আমি **আগমন না করলে এসব বিপদের প্রাদূর্ভাবে বিলম্ব ঘটতো।** তাই এসব দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে **'আগমনকারীর'** আহবানে মুসলমানদেরও মনোনিবেশ করতে হবে, খৃষ্টানদেরও করতে হবে আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও মনোযোগ দিতে হবে আর ধর্মহীনদেরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। তা না হলে এই 'আহ্বানকারী' এ ঘোষনাও দিয়ে গেছেন,

"হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশূণ্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল নীরব থেকেছেন। তাঁর চোখের সামনে ঘৃণ্য কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শ্রবণ করুক, সে সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি...।" এরপর তিনি বলেছেন,**"...খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, যেন তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হয়। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয়- কীট। যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয়- মৃত।"**
(হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২খন্ড পৃঃ ২৬৯)।

এই সেই বাণী যা প্রত্যেক আহমদী জগতের স্থিতির জন্য, পৃথিবীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জগতময় প্রদান করবে। আল-াহ তা'লা আমাদেরকেও খোদা তা'লাকে সত্যিকারভাবে চেনার সৌভাগ্য দিন। আমরা যেন সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার ক্রোধের পরিবর্তে তাঁর অনুকম্পা লাভকারী হতে পারি, আমীন॥

অনুবাদ : **আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**
ওয়াকেফে জিন্দেগী

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (রাহেঃ)-এর পক্ষ থেকে বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বন্ধুগণকে ঈদ মোবারকের তোহ্‌ফা

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ ইসলামাবাদে ২ ডিসেম্বর, ২০০০ ইং প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা]

আল্লাহ্‌তাআলা নিজের অনুগ্রহের প্রভাব তাঁর বান্দাদের মাঝে দেখতে পসন্দ করেন।

নেয়ামতের কথা প্রকাশ করার অর্থ এই নয়, মানুষ কেবল মুখেই তা বলতে থাকে বরং দেহেও এর প্রভাব বিকশিত হওয়া আবশ্যক।

নেয়ামতের স্বীকৃতির একটি দিক হলো, খোদার সৃষ্টির সেবা। আর এতে আবশ্যিক শর্ত এই, খোদাতাআলার সন্তুষ্টির খাতিরেই এ পুণ্যের কাজ হওয়া আবশ্যক।

তাশাহ্‌হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (রাহেঃ) সূরা যোহার ৭-১২ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

এর সরল অনুবাদ এই, তিনি কি তোমাকে এতীম পাননি এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেননি, আর তোমাকে (ঐশী-প্রেম ও মানব-প্রেমে আত্মহারা পান নি? এরপর তিনি (তোমাকে খোদা প্রাপ্তির ও মানব সংশোধনের জন্য) পথ প্রদর্শন করলেন। আর তোমাকে অভাবগ্রস্ত পেলেন, এরপর সম্পদশালী করলেন। অতএব এতীমের প্রতি তুমি কঠোর হয়ো না। এবং সাহায্যপ্রার্থীকে তুমি তিরস্কার করো না, আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের যে নেয়ামত তোমার ওপর রয়েছে তুমি অবশ্যই (অন্যের নিকট) তা বেশি বেশি বর্ণনা কর।

এ প্রসঙ্গে আমি সবার আগে তিরমিযীর কিতাবুল আদব থেকে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি ঃ হযরত আমর বিন শুয়ায়েব (রাঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে আর তিনি তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা এ কথা পসন্দ করেন যেন তিনি তাঁর কল্যাণের প্রভাব তাঁর বান্দার ওপর দেখেন। অর্থাৎ খোদাতাআলা যে কল্যাণ দিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হওয়া পুণ্যের কারণ হয়ে থাকে। মুসলিম কিতাবুয্‌যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্বের এবং বুখারী, কিতাবুর্ রিক্বাক্ব থেকে উদ্ধৃত অন্য একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তার প্রতি দেখ যে তোমার চেয়ে কম মর্যাদার লোক অর্থাৎ কম চাহিদার লোক। আবার সেই ব্যক্তির প্রতি দেখবে না যে, তোমার চেয়ে ওপরে রয়েছে অর্থাৎ তোমার চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে। এ রকম রীতি সেই কথারই অধিক প্রমাণ বহন করে, তুমি নিজের ওপর বর্ষিত কল্যাণকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে না।

বুখারীর অন্য আর একটি বর্ণনায় এ-ও এসেছে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির প্রতি যদি দেখে যাকে আর্থিক ও দৈহিক দিক থেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তাহলে তার প্রতিও তুমি দেখ, যে তার চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোক। এভাবে কল্যাণ লাভের কৃতজ্ঞতা সঠিক অর্থে আদায় হতে পারে। সব মানুষ সমান নয়। কেউ উঁচু মর্যাদার, কেউ মর্যাদায় নিচু। মানুষ কেবল উঁচু মর্যাদার লোকদেরই দেখতে থাকলে এতে হিংসা সৃষ্টি হবে। ঈর্ষা তো বৈধ কিন্তু হিংসা বৈধ নয়। কিন্তু এক উঁচু মর্যাদার লোকের প্রতি দেখা হলে তাকেও দেখা হোক যে তাথেকে নিচু মর্যাদার লোক। যাদের শিশুরা অসুস্থ বা আরও কোন কষ্টে পড়েছে তখন তার অবস্থা দেখে কল্যাণের কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে আদায় হতে পারে নচেৎ মানুষের নিজ অবস্থা সম্বন্ধে তার ধারণা সৃষ্টি হয় না।

কল্যাণের কথা বলে বেড়ানোর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, খোদার সৃষ্টির সেবা করা। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন বলবেন, হে ইবনে আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে খাবার খাওয়াওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমিতো বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক, আমি তোমাকে কিভাবে খাবার খাওয়াতাম। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তোমার কি জানা নেই, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলো আর তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি কি এটা বুঝতে

পারনি যে, তুমি তাকে খাবার খাওয়ালে তুমি যেন আমাকেই খাবার খাওয়াতে। কেননা, আমার সন্তুষ্টির খাতিরেই তাকে তুমি এ খাবার খাওয়ালে। আবার বলবেন, হে ইবনে আদম! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমাকে কেমনে পানি পান করাতাম। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো। তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি এটা বুঝতে পারনি, তুমি তাকে আমার সন্তুষ্টির খাতিরে পানি পান করালে তুমি যেন এ পানি আমাকেই পান করাতে আর আমি তোমাকে এর সওয়াব দিতাম।

এতে আবশ্যিক শর্ত এই, এ পুণ্য কর্ম খোদাতা আলার সন্তুষ্টির খাতিরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন লোকের মন থেকে এমনিতেই পুণ্যের কথা জাগরিত হয়। সে তা করেও থাকে। অথচ সে খোদার প্রতি ঈমান রাখে না। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তার কোন প্রতিদান নেই। প্রতিদান তো তাঁরই যে পুণ্য কাজ খোদার খাতিরে করা হয় আর তাকে আল্লাহ্তাআলা ভরপুর প্রতিদান দিয়েও থাকেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"স্মরণ রাখো! তুমিও আমাদের সাক্ষাৎ ও সৌন্দর্যের প্রত্যাশী। আর আমাদের মাহাত্ম্য ও উদ্দেশ্যের আকাঙ্ক্ষী ছিলে। সুতরাং যেভাবে আমরা পিতার স্থলে থেকে তোমার দৈহিক পরিপোষণ করেছি তেমনি আমরা শিক্ষকের স্থানে থেকে জ্ঞানের সমস্ত স্তরকে তোমার নিকট খুলে দেই ও আমার সাক্ষাতের শরবত সবচে' অধিক দান করি। আর তুমি যা চেয়েছো সেসব আমরা তোমাকে দিয়েছি। সুতরাং তুমিও প্রার্থীদেরকে বঞ্চিত করো না আর তাদেরকে ধমক দিও না এবং স্মরণ রেখো, তুমি অয়েল (অর্থাৎ যার অনেক বড় পরিবার) ছিলে আর তোমার জীবনোপকরণের বাহ্যিক সামগ্রী একবারেই কিছু ছিল না। সুতরাং খোদা স্বয়ং তোমার অভিভাবক হন এবং অন্যদের প্রতি হাত পাতা থেকে তোমাকে অভাবমুক্ত করে দেন। পিতারও মুখাপেক্ষী হওনি আর মাতারও হও নি, শিক্ষকেরও না। আর কারও প্রতি হাত পাতারও প্রয়োজন হয়নি বরং এসব কাজ খোদা তাআলা স্বয়ং নিজেই করে দিয়েছেন। আর জন্মের পর থেকেই তিনি তোমার পরিচর্যা করেছেন। সুতরাং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আর অভাবীদের সাথে তুমিও এমনই আচরণ করো" (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭৩)। অন্য আর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার জন্যে আবশ্যকীয় শর্ত বিনয়-নম্রতা; কিন্তু আয়াতে করীমার আদেশ মোতাবেক **–ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস**–ঐশী কল্যাণগুলো প্রকাশ করাও অত্যন্ত জরুরী (মকতুবাতে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, ২য় অংশ পৃষ্ঠা-৪৬)। এ ছাড়াও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"স্মরণ রাখো, মানুষের সর্বাবস্থায় দোয়ার প্রার্থী হয়ে থাকা আর **আম্মা বিনি'মাতি রব্বিকা ফাহাদ্দিস**-এর ওপর আমল করা উচিত। খোদা তাআলা প্রদত্ত নেয়ামত ও কল্যাণসমূহের কথা প্রকাশ করা উচিত। এতে খোদা তাআলার ভালবাসা বাড়ে এবং তাঁর আনুগত্য ও তাঁকে মান্য করার জন্যে একটি আবেগ সৃষ্টি হয়। প্রকাশ করার এ অর্থই নয় যে, মানুষ কেবল মুখে উচ্চারণ করতে থাকে বরং দেহের ওপরও এর প্রভাব পড়া আবশ্যক। যেমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা ভাল কাপড় পড়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন কিন্তু সে সব সময় নোংরা-ময়লা কাপড় পরে এবং মনে করে যেন তাকে দয়ার পাত্র মনে করা হয় বা তার স্বচ্ছল অবস্থার প্রকাশ যেন আর কারও কাছে না হয় - এমন ব্যক্তি পাপ করে। কেননা, সে খোদা তাআলার অনুগ্রহ ও বদান্যতাকে লুকোতে চায় আর কপটতার সাহায্য নেয়। ধোঁকা দেয়, ভুল ধারণা দিতে চায়। এটা মু'মিনের মর্যাদা থেকে অনেক দূরে.....

আমাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তম আদর্শ। আমাদের মঙ্গল ও সৌন্দর্য এতে নিহিত যেন যতটা সম্ভব তাঁর (সঃ) পদ-চিহ্ন অনুসরণ করি এবং এর পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ না রাখি" (আল-হাকাম, ৭ম খন্ড, ১৩ নম্বর, ১০-৪-১৮৯৩ ঈসাব্দ, পৃষ্ঠা ১-২)।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মলফূযাতের দ্বিতীয় খন্ডে বলেন ঃ

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো! যে ব্যক্তি খোদা তাআলার অনুগ্রহের ওপর সন্তুষ্ট হয় না এবং তা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করে না সে নিষ্ঠাবান নয়। আমার ধারণায়, যদি কোন ব্যক্তি খোদাতাআলার অনুগ্রহ সম্পর্কে সারা বছর ধরে প্রশংসা গাইতে থাকে তাহলে সে সারা বছর ধরে শোক প্রকাশকারীর চেয়ে উত্তম। যে বিষয় 'আল্লাহ্ বলেছেন' ও 'আল্লাহ্র রসূল বলেছেন'-এর পরিপন্থী হয়, অর্থাৎ তাতে শিরক (অংশীবাদিতা), রিয়া (অহংকার) থাকে এতে যদি সে নিজের বড়াই দেখায় তাহলে এটা পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং নিষিদ্ধ।

এ সংক্ষিপ্ত ঈদের খুতবার পর এখন আমি সকল জামাতকে, যারা এখানে উপস্থিত আছেন আর সে সব জামাত যা এখানে উপস্থিত নেই **ঈদ মুবারক**-এর তোহ্ফা দিচ্ছি। রাবওয়া থেকে আমাদের ভাই-বোনেরা এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণ, তদুপরি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ-এর কর্মকর্তাগণ, যারা কোনভাবেই আমার প্রিয়গণের চেয়ে কম নয়, ঈদ মুবারকের বাণী পাঠিয়েছেন। তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে ঈদ মুবারক। এভাবে আসীরানে রাহে মাওলা (খোদার পথে বন্দীগণ) এবং তাদের পরিবারবর্গ তাছাড়া আহমদীয়তের শহীদগণের পরিবারবর্গকে আমার পক্ষ থেকে ও নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে আন্তরিক ঈদ মুবারক।

এভাবে প্রায় সব দেশ থেকে অর্থাৎ জাপান, আমেরিকা, আফ্রিকা ও যত দেশ রয়েছে সব দেশ থেকে ঈদ মুবারক-এর বাণীতে আমার ফাইল ভরে গেছে। এতো আমার পক্ষে সম্ভবই নয় যে, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জবাব পাঠাই কিন্তু এদের সবাইকে আমি এতদোপলক্ষ্যে ঈদ মুবারক-এর তোহ্ফা দিচ্ছি। এভাবে ই'তিকাফকারীগণ রয়েছেন, যাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য দোয়ার পত্র পাওয়া গেছে। আল্লাহ্ তাদের ই'তিকাফ গ্রহণ করুন। এদের সবার আলাদা আলাদা নাম নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে 'ঈদ মুবারক'। (১৯-২৫ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের আল-ফযল ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে)

(পুনঃ মুদ্রিত)

সিয়াম সাধনা

একটি ইবাদত

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

রোযা রাখার জন্যে নিয়্যত বা সংকল্প আবশ্যকীয়

যে-ব্যক্তি রোযা রাখতে চান তার অবশ্যই নিয়্যত বা সংকল্প করা আবশ্যক। হযরত হাফসাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে নিয়্যত করে না তার জন্যে কোন রোযা নেই (তিরমিযী কিতাবুস্ সওম, পৃষ্ঠা ৭৭)।

রোযার নিয়্যত করার জন্যে নির্ধারিত কোন বাক্য মুখে আওড়ানোর প্রয়োজন নেই। নিয়্যত আসল মনের বাসনা ও ইচ্ছার নাম। রোযার নিয়্যত সুবেহ সাদেক বা ফজরের আগে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সোয়া ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা পূর্বে করা উচিত। নফল রোযার জন্যে দুপুরের আগেও নিয়্যত করা যেতে পারে তবে শর্ত এই নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত যেন কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা না হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণ থাকলে যেমন রমযানের চাঁদ দেখার সংবাদ সূর্য ওঠার পরে পাওয়া গেলে এবং তখনও কিছু খেয়ে বা পান করে না থাকলে সে সময় ফরয রোযার নিয়্যত করা যেতে পারে। এভাবে সেই ব্যক্তির রোযা হয়ে যাবে। (সুনানে আবু দাউদ, কিতবুস্ সিয়াম)

সেহরী খাওয়ার এবং ইফতার করার সময়

কুরআন পাক বলে–পানাহার কর যে পর্যন্ত সাদা সুতো কালো সুতো থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর না হয় অর্থাৎ তোমাদের কাছে উষার শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা থেকে পৃথক দৃষ্টিগোচর না হয়। এরপর রাত নেমে আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'তাসাহ্হারু ফা ইন্না ফিস্সাহূরি বারাকাতান' অর্থাৎ তোমরা সেহেরী খাও। নিশ্চয় এতে কল্যাণ রয়েছে। (বুখারী, বাবু বারাকাতিস সাহ্র, পৃষ্ঠা ৩৫১)।

একটি হাদীস থেকে জানা যায় নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে সেহরীর পর ফযরের আযানের জন্যে খুব কম সময়ই বাকী থাকতো। হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, কমপক্ষে (কুরআনের) ৫০টি আয়াত পড়তে যতটুকু সময়লাগে এ সময়টি এতটুকু হতো (বুখারী কিতাবুস সাওম) অর্থাৎ আনুমানিক ১০/১৫ মিনিট। হুযূর (সাঃ) সেহেরী খাওয়ার ব্যাপারে আরও বলেন, "শেষ রাতের এ কল্যাণপ্রদ খাদ্য রাতের শেষ অংশে খাও" (জামেউস সগীর, ১ম খন্ড, হাদীস নং ৩২৯২)। তিনি (সাঃ) আরও বলেন, "সেহরী খাও তা এক চুমুক পানিই হোক না কেন" (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩২৯৩)। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সেহরী খেতে খেতে আযান হয়ে গেলে খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এ হাদীসের বর্ণনাকারী (আবু দাউদ, মিশকাত)।

হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) সেহরী সম্পর্কে বলেন ঃ

"সেহরী খাওয়ার সময় ছোটদের উঠিয়ে খাওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা হোক। কাদিয়ানে এ রীতিই প্রচলিত ছিল। এটা খুবই আবশ্যকীয় ও কল্যাণপ্রদ। এখন এটা অনেক ঘরেই পরিহার করা হয়েছে" (খুতবা জুমুআ ৩০-৫-১৯৮৬)।

ইফতারের সময় সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **ইযা আক্বালাল্লায়লু মিন হাহুনা ওয়া আদবারান্নাহারু মিন হাহুনা ওয়া গাবাতিশ্ শামসু ফাক্বাদ আফত্বারাস্ সায়েমু** অর্থাৎ এ (পূর্ব) দিক থেকে যখন রাত আসে আর এ (পশ্চিম) দিক থেকে দিন চলে যায় এবং সূর্য যখন অস্ত যায় তখন ইফতার করবে (বুখারী, কিতাবুস সাওম)। ইফতারের সময় হওয়া মাত্র ইফতার করার জন্যেও হুযূর (সাঃ) তাগিদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। যেমন হযরত সুহায়েল বিন সা'আদ (রাঃ) বর্ণনা করেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অর্থাৎ মানুষ যতদিন (সময় হওয়ার সাথে সাথে) শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে থাকবে (বুখারী কিতাবুস্ সাওম, পৃষ্ঠা ২৬৩)।

কুরআন হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা সেহরী ও ইফতারীর সময় নির্ধারণ করতে পারি। সরকারী আবহাওয়া অফিস থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের যে সময় ঘোষণা করা হয় এর ওপর ভিত্তি করে সময় নির্ণয় করলে বিভ্রান্তি ও মতভেদের সম্ভবনাকে এড়ানো যেতে পারে। এত সব স্পষ্ট নির্দেশাদি থাকার পরও আমরা দেখতে পাই সেহরী খাওয়া ও ইফতার করার সময় নিয়ে বিভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়। কারও মতে ৩/৪ মিনিট বেশি কারও মতে আরও বেশি বা অন্য রকম। এ যেন খোদাকে জোর করে সন্তুষ্ট করার কসরৎ আর কি! আমাদের জামাত আবহাওয়া বিভাগের ঘোষণা অনুযায়ী সঠিক সময়ে ইফতার ও সেহরী করে থাকে।

কি দিয়ে রোযা ইফতার করতে হবে

খেজুর, দুধ, সাধারণ পানি দিয়ে রোযা ইফতার করাই উত্তম পদ্ধতি। তবে দেশ কাল সামর্থ্য ভেদে যে কোন বৈধ জিনিষ দিয়ে ইফতার করা যায়। আমাদের দেশে বুট, মুড়ি, পিঁয়াজু ছাড়া যেন ইফতারীর কল্পনাই করা যায় না। সে যা-ই হোক অযথা ও বাহুল্য ব্যয় যেন না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সারা দিন রোযা রেখে কৃচ্ছ্রতা সাধন করা

হয়েছে আর ইফতার করতে গিয়ে তা যেন ক্ষুণ্ন করে ফেলা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক পরিবারে ইফতারীর পদ ও প্রকার যোগান দিতে দিতে মহিলারা এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে সময় মত ইফতারও করতে পারেন না। সকাল থেকে কেবল পরিকল্পনা করতে থাকেন কি দিয়ে ইফতার করবেন। এটা রমযানের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং যতটা সময় আল্লাহ্‌র যিকর ও দোয়া দুরূদ পাঠে ব্যয় করা যায় ততটাই মঙ্গল। আর নবী (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে তা-ই জানা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করে ইফতার করতেন ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী লাকা সুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফতারতু অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার উদ্দেশ্যেই রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযক (জীবনোপকরণ) দিয়েই ইফতার করছি (আবূ দাউদ কিতাবুস সওম, পৃঃ ৩২২)। ইফতারের পর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি (সাঃ) এ দোয়াও করতেন ঃ

যাহাবায যামূউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু ওয়া সাবাতিল আজরু ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ পিপসা দূর হলো। শিরা উপশিরাগুলো সিক্ত হলো। আর আল্লাহ্ চাইলে প্রদিদান নির্ধারিত হলো (আবূ দাউদ, কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা ৩৩১)।

সারাদিন রোযা রেখে ঘরে উপকরণ থাকা সত্ত্বেও অভুক্ত থেকে দুঃখী মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করা রোযার বিভিন্ন উদ্দেশ্যাবলীর একটি। তাই রোযাদারকে রোযা ইফতার করানোর প্রতি প্রিয় নবী (সাঃ) তাগিদ দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) বলেছেন–**মান ফাত্বারা সায়েমান কানা লাহূ মিসলু আজরিহী গয়েরা আন্নাহূ লা ইয়ানক্বুসু মিন আজরিস্ সায়েমি শায়উন** অর্থাৎ যে-ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতারী করায় সে-ও অনুরূপ পুণ্য লাভ করে অথচ রোযাদারের পুণ্য কোন অংশে কমে যায় না (তিরমিযী কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা ১০০)।

হুযূর (সাঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি না করে কোন কোন লোক বা গোষ্ঠী ইফতার পার্টির নামে এমন সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাতে রমযান ও রোযার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেতিবাচক ফলোদয় ঘটিয়ে থাকে। এর পেছনে অনেক সময় রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যও আমরা সমাজে দেখতে পাই। আবার কোন কোন লোক ইফতারীর দ্রব্য কেবল ধনীদের পাঠিয়ে থাকে নাম করার লক্ষ্যে বা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে অথচ গরীবদের কথাটা বেমালুম ভুলে যায়। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (রাহেঃ) বলেন ঃ

"ইফতারীর দ্রব্য সামগ্রী নিজের চেয়ে ধনীদের বা নিজের সমতুল্য অবস্থাসম্পন্ন ধনীদের পাঠানোর পরিবর্তে অন্বেষণ কর তুলনামূলকভাবে কারা খোদার মিসকীন.....তাই সেই ব্যক্তি যে খোদার খাতিরে কাউকে সন্তুষ্ট করতে চায় তার উচিত সে যেন এমন লোকেদের অন্বেষণ করে যাদের দৈনন্দিন খাবার দাবারের মান এতটা উঁচু নয় যতটা তাদের রয়েছে।.....সুতরাং উত্তম ইফতারীর ব্যবস্থা এই হবে, আপনি নিজের প্রতিবেশিদের মাঝে দেখুন, নিজের আশেপাশে অন্বেষণ করুন এবং দৈনন্দিন জানা শোনা লোকদের পাঠিয়ে দিন। তবে সদকার আকারে পাঠবেন না। কেননা, ইফতারীর সম্পর্ক সদকার সাথে নয়। ইফতারীর সম্পর্ক সম্প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধির সাথে।..... আর এভাবেই আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে উচ্চ এবং নিম্ন পর্যায়ের লোকদের মাঝে পরস্পরের সৌহার্দ্য আগের চেয়ে সুদৃঢ় হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ ইফতারীর দাওয়াতের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই, একেতো মানুষ ইফতারী তৈরী করে কারও ঘরে পাঠিয়ে দেয় যেন সেদিন দোয়ায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।..... কিন্তু আপনি যখন ইফতারীর দাওয়াত দেন সেক্ষেত্রে কখনও কখনও উল্টো ফল প্রকাশ করে। মানুষ রোযা খুলে যিকরে ইলাহীতে নিয়োজিত হওয়ার পরিবর্তে, কুরআন করীম তেলাওয়াত করা হয় যে তারাবীতে সেই তারাবীর প্রস্তুতি নেয়ার পরিবর্তে গল্পের মজলিসে বসে যায়। এটা কখনও কখনও এত দীর্ঘ হয়ে যায় যে, ইবাদত বন্দেগীও নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আর সেদিন যদি ইশার নামায পড়েও নেন সময়ের টানাটানিতে অন্যদিকে তাহাজ্জুদের নামাযে প্রভাব পড়ে যাবে।..... রমযান মাসে এ ধরনের খোশ গল্প করা আমার দৃষ্টিতে রমযানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ও নতুন বিধান (বি'দাত) সৃষ্টির তুল্য।..... যতদূর সম্ভব সেহরী ও ইফতারের সময়টাকে তরবিয়তের কাজে লাগান এবং তরবিয়তের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলুন" (জুমুআর খুতবা, ১৭-১-১৯৯৭)।

আমাদের জামাতে মসজিদে ইজতেমায়ী ইফতারীর ব্যবস্থা থাকে জামাতের পক্ষ থেকে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা এতে অংশ গ্রহণ করে পুণ্যের অংশীদার হতে পারেন।

কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয়

আগেই একথা উল্লেখ করে এসেছি যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে-ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও আচরণ বর্জন করে না আল্লাহ্‌র কোনই প্রয়োজন নেই যে, সে (অযথা) পানাহার থেকে বিরত থাকে (বুখারী)। প্রকৃতপক্ষে রোযাদার উপরোক্ত সতর্কবাণীর ওপর দৃষ্টি না রেখে রোযা রাখলে তার রোযা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। আর এটা তার জন্যে রোযা না রাখারই শামেল। এছাড়া সাধারণত নিম্নবর্ণিত করণে রোযা ভঙ্গ হয় ঃ (১) জ্ঞাতসারে পানাহার করলে (২) স্ত্রী সংগম করলে (৩) রক্তক্ষরণ করলে(৪)

ইনজেকশন নিলে এবং (৫) ইচ্ছাকৃত বমি করলে। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয় না (তিরমিযী)।

ভুলে যদি কেউ রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কোন পাপ নেই। কিন্তু সেই রোযা কাযা করা আবশ্যক। রোযাদার অবস্থায় মহিলাদের মাসিক আরম্ভ হয়ে গেলে বা সন্তান জন্ম দিলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সেই দিনগুলোর রোযা পরে আদায় করা আবশ্যক। (সূত্র ঃ ফেকাহ আহমদীয়া)

কি কি কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

আগেই বলেছি ভুলে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হয় না (বুখারী কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা ২৫৯)। রোযা অব্যাহত রাখবেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি গলা বা পেটে ধোঁয়া, ধূলো, মাছি, মশা যায় বা কুলি করার সময় সামান্য পানি পেটে চলে যায় তবে রোযা ভঙ্গ হয় না। এভাবে কানে পানি গেলে বা ঔষধ দিলে, শ্লেষ্মা বের হলে বা স্বাভাবিকভাবে ঢোক গিললে, অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে, চোখে ঔষধ দিলে, গরমের প্রকোপে নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, দাঁত থেকে রক্ত বের হলে, বসন্তের টিকা নিলে, মেসওয়াক বা ব্রাশ করলে, সুগন্ধি নিলে, নাকে ঔষধ দিলে (বুখারী পৃষ্ঠা ১৫৯)। মাথায় ও দাঁড়িতে তেল দিলে, শিশু বা স্ত্রীকে চুমু খেলে, দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে (তিরমিযী পৃষ্ঠা ৯০), অসুবিধার কারণে সেহরীর সময় ফরয গোসল না করতে পারলে রোযা ভঙ্গ হয় না। মেয়েরা দিনের বেলায় সুরমা লাগাতে পারে। পুরুষদের বেলায় আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, হে প্রিয়গণ! রোযা রেখে দিনের বেলায় সুরমা লাগিও না। রাতের বেলায় অবশ্যই লাগাতে পার (মুসনাদ, দারিমী)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, দিনের বেলায় সুরমা লাগানোর দরকারই বা কি? রাতে লাগাও (বদর, ৭-২-১৯০২) [সূত্র ঃ ফিকাহ্ আহমদীয়া]।

একটি সতর্কবাণী

বিনা কারণে বা সামান্য সামান্য কারণে বাহানা করে রমযানের রোযা পরিহার কারা উচিত নয়। এমন সব লোক যারা জেনে বুঝে রোযা রাখে না তাদের প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

যে-ব্যক্তি বিনা কারণে রমযানের একটি রোযাও পরিত্যাগ করে সে ব্যক্তি পরে যদি সারা জীবনও এর বদলে রোযা রাখে তাহলেও এর পরিশোধ হতে পারে না। আর এ ভুলের প্রতিকার হতে পারে না। (মুসনাদ আহমদ, দারিম, পৃষ্ঠা ১৫৬, ফেকাহ আহমদীয়ার বরাতে)।

সফরে রোযার নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা

সফর বা রুগ্ন অবস্থায় রোযা রাখা সম্বন্ধে আল কুরআনের বিধান হলো–**ফামান কানা মিনকুম মারীযান আও আলা সাফারিন ফা 'ইদ্দাতুম মিন আইয়্যামিন উখার** অর্থাৎ কিন্তু তোমাদের মাঝে কেউ যদি রুগ্ন হয় বা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫ আয়াতাংশ)।

এথেকে জানা গেল রোযা রাখার জন্যে যেমন আদেশ তেমনি রুগ্ন ও সফরের অবস্থায় অন্য সময়ে পূর্ণ করারও তেমনি আদেশ দেয়া হয়েছে। তবে অবস্থা ভেদে পরবর্তীতে এ আয়াতে আবার আদেশ দেয়া হয়েছে– **আন তাসুমু খায়রুল্লাকুম** অর্থাৎ রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম। হাদীস পাঠে আমরা জানতে পারি নবী করীম (সাঃ) বলেছেন **লায়সা মিনাল বিররি আসসাওমু ফিস্ সাফারি** অর্থাৎ সফরে রোযা রাখা কোন পুণ্যের কাজ নয় (বুখারী)। আবার তিনি কোন কোন সফরে রোযা রাখতে বলেছেন বলেও হাদীস পাঠে আমরা জানতে পারি। সুতরাং বিষয়টি আমরা বর্তমান যুগের ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার আলোকে বুঝতে চেষ্টা করবো ঃ (১) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সফরে রোযা রাখাকে হুক্‌মে উদূলী (আদেশ অমান্য করা) বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব হুযূর (আঃ) বলেন ঃ

"রুগ্ন ও সফরকারী রোযা রাখলে তার প্রতি হুক্‌মে উদূলী অর্থাৎ আদেশ অমান্যের বিধি বলবৎ হবে" (আল বদর, ১৭-১০-১৯০৭)। হুযূর (আঃ)-এর সিদ্ধান্ত কুরআনের **ফাইদ্দাতুম মিন আইয়্যামিন উখার** (সূরা বাকারা ১৮৫ আয়াতাংশ) এর ওপর ভিত্তি করে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহের সামগ্রিক তাৎপর্য থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম রমাযান মাসে সফরে রোযা রাখাকে অবাধ্যতা আখ্যা দিয়েছেন (মুসলিম কিতাবুস সাওম, পৃষ্ঠা ৪৬৫)। যেসব হাদীস থেকে অবকাশ সম্পর্কে জানা যায় ইমাম যুহরী (রহঃ) এসব হাদীসকে প্রাথমিক সাব্যস্ত করেছেন। অতএব এ প্রসঙ্গে সহী মুসলিমের ব্যাখ্যা রয়েছে (পৃষ্ঠা ৪৬৪)।

(২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বাইরের থেকে আগমনকারী আহমদীদের জন্যে কাদিয়ানকে দ্বিতীয় জন্মভূমি আখ্যা দিয়েছেন। তাই তারা সেখানে অবস্থান করাকালীন সময় (রোযা) রাখতে পারে। আর যদি না রাখে তা হলেও বৈধ।

(৩) দ্বিতীয় জন্মভূমির দিকে সফরও আসলে সফর। তাই রোযা রাখা বৈধ নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইফতারীর পূর্বে কাদিয়ান আগমনকারী রোযাদারের রোযা খুলিয়ে দিয়েছেন।

(৪) যেসব লোকের চাকুরীই সফরের যেমন রেলওয়ে গার্ড, ড্রাইভার, পাইলট, ভ্রমণকারী এজেন্ট, গ্রাম্য হকার ইত্যাদি এরা মুকীম (অর্থাৎ বাড়ীতে অবস্থানকারী)-এর অন্তর্ভু হবেন এবং রমযানের রোযা রাখবেন (মজলিসে ইফতার সিদ্ধান্ত, পৃষ্ঠা ২৬, তাং ২৬-২-১৯৬৭)

হযরত আকদাস আলায়হেস সালাম সফরে রোযার আদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ

রেলের সফর যদি হয় আর কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তবে (রোযা) রেখে নিবে নচেৎ খোদা তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত অবকাশের সুযোগ নিবে (আল হাকাম (২৪-১২-১৯০০)।

রুগ্ন অবস্থায় রোযার প্রসঙ্গ

অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা থেকে আল কুরআন অবকাশ দিয়েছে। সুস্থ হলে তা পুরো করার বিধান দিয়েছে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই রোযা। সুতরাং অসুখের বাহানা করে যেন কেউ রোযা থেকে বিরত না থাকেন সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি রুগ্ন অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে খোদাতাআলার সুস্পষ্ট আদেশের অবাধ্যতা করে। খোদা তাআলা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন রুগ্ন এবং মুসাফির রোযা রাখবে না। রুগ্ন সুস্থ হলে এবং সফর শেষ হওয়র পর রোযা রাখবে। খোদার এই আদেশ অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য। কেননা, মুক্তি অনুগ্রহের মাধ্যমেই মিলতে পারে। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে না। খোদা তাআলা এটা বলেন নি, রোগ বেশি হোক বা কম, সফর সংক্ষিপ্ত হোক বা দীর্ঘ বরং আদেশটি সাধারণ। এর ওপর আমল করা আবশ্যক। রুগ্ন এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের ওপর হুক্মে উদূলী অর্থাৎ আদেশ অমান্য করার বিধান প্রযুক্ত হবে" (বদর, ১৭-১০-১৯০৮)।

রোযা রাখার বয়স

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) 'বাবু সাওমুস্ সাবিয়্যান' অর্থাৎ বালক বালিকাদের রোযা প্রসঙ্গে আলাদা একটি অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। আর এতে হযরত উমর (রাঃ)-এর একটি বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি এক মাতাল ব্যক্তিকে বললেন, তুই ধ্বংস হ'। আমাদের শিশুরা রোযা রাখছে আর তুই কিনা মদ গিলেছিস? সুতরাং তাকে বেত মারা হলো।

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরাহ (দশই মুহাররম)-এর রোযা প্রসঙ্গে হযরত রুবাইয়ে বিনতে মুআওয়েজ এটি বর্ণনা করেন। এথেকে জানা যায় ছোটরাও এ রোযা রাখতো (বুখারী, কিতাবুস সাওম)।

কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর এত কড়াকড়ি করা হয়নি। ছোটদের দিয়ে অভ্যাসের জন্যে এক আধাটা রাখানো হতো।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) রোযা রাখার বয়স সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ

কোন কোন লোক ছোটদের দ্বারা রোযা রাখান। অথচ প্রত্যেকটি ফরয আদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সীমা নির্ধারিত আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়ে থাকে। আমাদের কাছে কোন কোন আদেশ নিষেধের সময় ৪ বছর বয়স থেকে আরম্ভ হয় এবং কোন কোন আদেশ নিষেধের সময় ৭ বছর থেকে ১২ বছর নির্ধারিত। আর কোন কোন আদেশ নিষেধের বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের যুবকদের প্রতি আরোপিত হয় এবং এটাই সাবালকত্বের সীমারেখা। ১৮ বছর বয়স থেকে রোযা রাখানোর অভ্যাস করানোর দরকার। ১৮ বছর বয়স থেকে রোযা ফরয মনে করা উচিত। আমার মনে আছে, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদেরও রোযা রাখার শখ হতো। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের রোযা রাখতে দিতেন না। আর আমাদের রোযা রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার নির্দেশ না দিয়েই আমাদের ওপর প্রভাব খাটাতেন। তাই ছোটদের শরীর সুস্থ রাখতে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে রোযা রাখা থেকে তাদের বিরত রাখা উচিত। এরপর তাদের জন্য যখন সময় হয়ে যায়, তারা যখন নিজেদের পুর্ণ শক্তিতে পৌছে যায়, ১৫ বছরের সময় কাল যখন এসে যায় তখন তাদের দিয়ে রোযা রাখানো হোক এবং তা-ও ধীরে সুস্থে। প্রথম বছর যে কয়টি রাখে পরের বছর তাথেকে বেশি এবং এর পরবর্তী বছর তাথেকে বেশি রাখানো হোক। এভাবে তাদের রোযার অভ্যাস করানো দরকার (আল্ ফযল, ১১-৪-১৯২৫)

ঋতুবতী, প্রসূতি বা স্তন্যদায়িণী ও গর্ভবতী মহিলাদের রোযা

ঋতুবতী মহিলারা রোযা রাখতে পারে না। কুরআনে যদিও এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলা হয়নি। তবুও এটা একটা রোগের অবস্থা এবং মহিলাদের জন্যে একটি কষ্টদায়ক অবস্থা। তাই তাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরে তারা রোযা রাখবেন এবং থেকে যাওয়া রোযা পরে পুরো করবেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে আমরা ঋতুর কারণে রোযা রাখতাম না। আমাদের সেই রোযাগুলো পরে রাখার নির্দেশ দেয়া হলো (সুনানি ইবনে মাজাহ)।

প্রসূতী মহিলাদের জন্যেও রোযা না রাখার আদেশ প্রযোজ্য। নেফাসের সময় সীমা অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিন গত হলে তারা তাদের থেকে যাওয়া রোযা রেখে নিবেন।

প্রসূতী গর্ভবতী মহিলাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ সফরকারীদের অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন এবং গর্ভবতী ও প্রসূতী বা দুগ্ধদানকারী মহিলাদের রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন" (তিরমিযী, আবওয়াবুস সাওম)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) গর্ভবতী মহিলা এবং

স্তন্যদায়িণী মহিলাদের রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

অর্থাৎ এরা নিজেদের রোযা না রাখার কারণ শেষ হওয়ার পর, থেকে যাওয়া রোযাগুলো পুরো করে নিবে। সামর্থ্য থাকলে ফিদিয়াও (ফিদিয়া সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি–প্রবন্ধকার) আদায় করে দেবে। রমযানের কল্যাণমন্ডিত মাসে ইবাদত পালন করা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে এটা তাদের জন্যে কাফ্ফারার কাজ দেবে। ফিদিয়া আদায় করার সামর্থ্য না থাকলে রোযাই যথেষ্ট (সূত্র ঃ রোযা সম্বন্ধে মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেবের প্রবন্ধ)।

ফিদিয়া প্রসঙ্গ

মানুষ যেন রোযাও রাখে এবং সামর্থ্য থাকলে ফিদিয়াও দেয়। এটাই সাধারণ নির্দেশ। রোযা রাখলে ফরয আদায় হবে এবং ফিদিয়া আদায় করলে সুন্নত পালন করা হবে। এটা রোযা রাখতে পারার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ হবে। রোযা রেখে যে ফিদিয়া আদায় করে সে অধিক পুণ্যের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি সাময়িকভাবে রুগ্ন হওয়ার কারণে কয়েকটি রোযা রাখতে পারেনি তার জন্যে ফিদিয়া নয়। রমযানের রোযার অবশ্যদেয় ফিদিয়া কেবল সেসব সামর্থ্যবান লোকদের জন্যে যাদের ব্যাপারে খুব নিকটবর্তী সময়ে তারা সেগুলোর কাযা করতে পারবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই এবং যারা খুবই বৃদ্ধ যাদের শক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছে বা চিররুগী বা গর্ভবতী। প্রত্যেক ভাঙ্গতি রোযার বদলে এক অভাবী ব্যক্তিকে দু'বেলা খাবার দিবে বা এর সমপরিমাণ অর্থ দিবে। এরই নাম হলো ফিদিয়া। প্রত্যেক বছর জামাত থেকে ফিদিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে ঘোষণা দেয়া হয়। শহরের ও গ্রামের আলাদা আলাদা পরিমাণ।

সাময়িক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেলে ফিদিয়া দেয়া হোক বা না হোক রোযা কিন্তু রাখতেই হবে। ফিদিয়া দেয়ার কারণে রোযার আদেশ অকার্যকর হয়ে যায়নি। এক ব্যক্তি কখনও রোযা রাখেনি। এর ফিদিয়া কি হবে সেই প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "খোদা তাআলা কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে রেখে দেননি। সামর্থ্যানুযায়ী বিগত দিনের ফিদিয়া আদায় করে দাও। সব রোযা রাখবে ভবিষ্যতের জন্যে অঙ্গীকার কর (আল বদর, খন্ড, নম্বর ১২, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পৃষ্ঠা ৯১)।

ফিদিয়ার পরিমাণের ব্যাপারে কুরআনী নির্দেশনা এই ঃ **মিন আওসাতি মা তুত্বইমূনা আহলিকুম** অর্থাৎ তোমরা সাধারণত যে খাদ্য তোমাদের পরিবার পরিজনকে খাইয়ে থাক (সূরা মায়েদা ঃ ৯০)। নিজেদের মধ্যম প্রকারের খাবার অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো আবশ্যক।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর পরিমাণ গমের আকারে অর্ধেক সা' অর্থাৎ পৌনে ২ সের বর্ণনা করেছেন। এটা একটা ভাঙ্গতি রোযার জন্যে প্রদেয় ফিদিয়া। এক ব্যক্তির দুই ওয়াক্তের খাবারের প্রয়োজন এটা মিটাবে। ফিদিয়া কেবল একজন রোযাদার গরীবকেই দিতে হবে এটা আবশ্যক নয়। আসল উদ্দেশ্য অভাবী ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। এ ভাবেই ফিদিয়া আদায় করা তাদের জন্যে বাধ্যকর যাদের সামর্থ্য আছে। নতুবা একজন অপারগ ব্যক্তির জন্যে অনুশোচনা তওবা-ইস্তিগফার, দোয়া ও অধিক পরিমাণে যিকরে এলাহি তা পূরণ করে দেবে। ফিদিয়ার অর্থ জামাতের মাধ্যমে সংগ্রহ ও বন্টন করা বাঞ্ছনীয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, ফিদিয়া আদায় করলে পুনরায় রোযা রাখার সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "যেসব রুগী ও সফরকারীর কখনও রোযা রাখার সুযোগ আসবে এমন আশা নেই, অথচ একজন বৃদ্ধ বা একজন দুর্বল গর্ভবতী মহিলা যে দেখে যে সন্তান জন্ম নেয়ার পরও সন্তানের দুধ পান করার কারণে সে পুনরায় অপারগ হয়ে যাবে এবং সারা বছর এভাবে কাটাতে হবে তাদের জন্যে রোযা না রাখা বৈধ হবে। কেননা তারা রোযা রাখতেই পারে না। তাই তারা ফিদিয়া দিবে।

ফিদিয়া কেবল অতি বৃদ্ধ বা এরকম লোকদের জন্যে যারা রোযা রাখার ক্ষমতা কখনও রাখে না। অবশিষ্ট কারও জন্যে এটা বৈধ নয় যে, তারা ফিদিয়া আদায় করে দিলেই তাদের রোযা রাখার জন্যে অপারগ মনে করা যেতে পারে। সাধারণ লোকদের মাঝে যারা স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ করে তাদের বেলায় কেবল ফিদিয়া দিবার ধারণা বি'দাতের দরজা খুলে দেয়ার শামেল" (ফাতাওয়া আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

ক্বিয়ামুল লায়ল

ক্বিয়ামুল লায়ল অর্থ রাতে দাঁড়ানো। রমযান মাসে রাত জেগে আল্লাহ্‌র সমীপে দাঁড়িয়ে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভকে এক কথায় কিয়ামুল লায়ল বলা হয়। ইবাদতের মাধ্যমে রমযানের রাতগুলো জীবিত রাখা অর্থাৎ কম ঘুমানো এবং রাতের ইবাদত বন্দেগীর জন্যে জাগ্রত থাকার মাঝে অনেক কল্যাণ নিহিত এবং সৌভাগ্যেরও কারণ, বিশেষ করে রাতের শেষ প্রহর দোয়ার কবুলিয়্যত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বড় মোক্ষম সময়।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইবাদতের মাস হিসাবে পবিত্র রমযানকে অন্যান্য মাসের চেয়ে উত্তম নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ঈমানের সাথে ও হিসাব করে এবং রাতে উঠে ইবাদত করে কাটায় আর নিজ পাপ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যে, তার

অবস্থা সেই দিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল" (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস সিয়াম)।

নামায তারাবীহ

রমযান মাসে কিয়ামুল লায়ল বা রাতের নফল ইবাদতের মাঝে নামায তারাবীহ উল্লেখযোগ্য। তারাবীহ্ অর্থ হলো বসা, আরাম করা। নামায তারাবীহ আসলে তাহাজ্জুদের স্থালাভিষিক্ত। পবিত্র রমযান মাসে সাধারণের সুবিধার জন্যে রাতের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ইশার সুন্নত নামাযের পর এ নামায পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় থেকে এ নামাযের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রমযানেও রাতের শেষ অংশে এ নামায আদায় করা উত্তম। তারাবীহ নামায পড়লেও শেষ রাতে সেহরীর আগে তাহাজ্জুদ নামায পড়া যায়। বরং পড়া উচিত। ছোটদের তরবিয়ত দেয়ার জন্যে এ সময়ে তাদের জাগানো উচিত এবং কমপক্ষে ২ রাকাআত হলেও তাদের এ নামায পড়ানো উচিত।

নামায তারাবীহতে গোটা কুরআন করীম শুনানোর ব্যবস্থা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর সময় থেকেই চলে এসেছে।

নাজাত বা পরিত্রাণ লাভে পবিত্র রমযানের শেষ দশক

কোন প্রিয় সত্তার বিদায়ের ক্ষণ যখন ঘনিয়ে আসে তখন বাধা বন্ধনহীন প্রেমের আবেগ উছলিয়ে ওঠে। রমযানকে বিদায় দিতে গিয়ে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামেরও এমনটি হয়ে থাকতো। আধ্যাত্মিক বসন্ত নিজের চমক দেখিয়ে যখন বিদায় নেয়ার ক্ষণে পৌছে যেতো তখন তিনি (সাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন আর রমযানের কল্যাণরাজিতে নিজ ডালি ভরে নিতে কোন ত্রুটি করতেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (রমযানের) শেষ দশকে প্রবেশ করলে কোমর বেঁধে নিতেন অর্থাৎ খুবই তৎপর হতেন এবং নিজ রাতগুলো (ইবাদতের মাধ্যমে) জীবিত করতেন। সাথে সাথে তাঁর (সাঃ) পরিবার পরিজনকেও জাগাতেন (বুখারী, কিতাবুস্ সওম)।

শেষ দশকে আঁ হযরত (সাঃ) ই'তেকাফে বসতেন এবং লায়লাতুল কদরের অন্বেষণে রাতগুলো (ইবাদতের মাধ্যমে) জাগিয়ে রাখতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) বলেছেন ঃ

"রমযান যখন শেষ প্রান্তের দিকে চলে আসে তখন এর অবস্থা এই রকম হয় যেভাবে ঝর্ণার কাছাকাছি পানি প্রবাহের হয়ে থাকে। এতে একটা চঞ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি হয়। আর রমযানের শেষ দিকে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অশ্রুপাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। এটা অন্তর থেকে প্রস্ফুটিত হয়.....যেদিনগুলো অবশিষ্ট থাকে সেগুলোর প্রতি যত্নবান হোন। এদিনগুলো নিজের মত করে এমনভাবে কাটিয়ে দিন যেন সেদিনগুলো আপনার আদরের দিনে পরিণত হয়। আর সেদিনগুলো নিজের মত করে এমনভাবে কাটিয়ে দিন যেন সেদিনগুলোর কল্যাণরাশি আপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়" (খুতবা জুমুআ ২/২/১৯৯৪)।

ই'তিকাফ

ই'তিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বা অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় **আল্লাবছু ফিল মাসাজিদি মাআস্ সওমি ওয়া নিয়্যাতিন ই'তিকাফি** ইবাদতের সংকল্প নিয়ে রোযা রেখে মসজিদে অবস্থান করার নাম ই'তিকাফ (হিদায়া, বাবুল ই'তিকাফ)। রোযার মত ই'তিকাফের অস্তিত্ব অন্যান্য ধর্মে দেখতে পাওয়া যায় (সূরা বাকারা, ১২৬)। আঁ হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বের দিনগুলোতে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পৃথক হয়ে হেরা গুহায় গিয়ে তাঁর বিভু স্মরণে লিপ্ত থাকাও এ ধরনেরই ই'তিকাফ ছিল। মানুষ যেদিন চায় যখন চায় ই'তেকাফে বসতে পারে। কিন্তু রমযান মাসে শেষ দশকে ই'তিকাফে বসা সুন্নতসম্মত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায়, আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর (সাঃ) পবিত্র স্ত্রীগণও এ সুন্নতের অনুসরণ করতেন (সহী মুসলিম, কিতাবুল ই'তিকাফ)।

ই'তিকাফের জন্যে কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। মু'তাকিফ (অর্থাৎ যিনি ই'তিকাফ করবেন) সময় নির্ধারণ করবেন। তবে আঁ হযরত (সাঃ)-এর ব্যবহারিক জীবন থেকে প্রাপ্ত মসনূন রীতি এই, কমপক্ষে যেন ১০ দিন ই'তিকাফে বসা হয়। হাদীসে এসেছে হুযূর (সাঃ) রমযান মাসে ১০ দিনই ই'তিকাফে বসতেন। উল্লেখ্য, নবী করীম (সাঃ) জীবনের শেষ রমযানে ২০ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন।

২০শে রমযান ফজরের নামাযের পর ই'তিকাফ আরম্ভ করা উচিত। এজন্যে ১৯শে রমযান বাদ মাগরিব ই'তিকাফস্থলে এসে যাওয়াই অনেকে ভাল মনে করে থাকেন। আমাদের জামাতে জামাতীভাবে ই'তিকাফের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মু'তাকিফদের একজন আমীর নিযুক্ত করে দেয়া হয়। এভাবে এটা একটি জামাতী রূপ পরিগ্রহ করে। মু'তাকিফরা ব্যক্তিগত দোয়া ছাড়াও জামাতের জন্যেও সময়োপযোগী দোয়া করেন।

ই'তিকাফের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো জামে' মসজিদ অর্থাৎ যে মসজিদে জুমুআর নামায হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন করীমে উল্লেখ এসেছে **ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ** অর্থাৎ তোমরা

মসজিদে ই'তিকাফ কর (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮ আয়াতাংশ)। হাদীসেও নির্দেশ এসেছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন **লা ই'তিকাফা ইল্লা ফিল মাসজিদুল জামে'** অর্থাৎ জামে' মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ নেই। (আবুদাউদ, কিতাবুল ই'তিকাফ, পৃঃ ৩৩৫)।

ইমামগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ই'তিকাফ যে কোন মসজিদে বা অপারগতার কারণে মসজিদের বাইরেও ই'তিকাফ হতে পারে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ "মসজিদের বাইরেও ই'তিকাফে বসা যেতে পারে। তবে মসজিদে ই'তিকাফ করার মত পুণ্য লাভ হতে পারে না (আল ফযল ঃ ২/৩/১৯৬২)। মহিলারাও মসজিদে ই'তিকাফে বসতে পারেন। কিন্তু ঘরে নামাযের জন্যে একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে সেখানে ই'তিকাফে বসা তাদের জন্য উত্তম (হিদায়া, বাবুল ই'তিকাফ, পৃষ্ঠা ১৯০। সূত্রঃ ফিকাহ আহমদীয়া)।

কুরআন হাদীস এবং ইমামদের মতে ই'তিকাফের জন্যে রোযা রাখা আবশ্যকীয়।

মু'তাকিফ (ই'তিকাফকারী) নিজেকে সর্বৈব খোদার সমীপে উপস্থাপন করে দেয় এবং বলে, হে খোদা! আমি তোমার কসম খাচ্ছি। আমি এখন থেকে ততক্ষণ উঠতে যাচ্ছি না যতক্ষণ তুমি আমার প্রতি কৃপা না করবে (দূররে মনসূর, পৃষ্ঠা ২০২)। সুতরাং ই'তিকাফকারী দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন তিনি তাঁর অভীষ্ট মনোবাসনা পূর্ণ করে তবে ই'তিকাফ থেকে উঠতে পারেন। এটা কঠিন সাধানার বিষয়। তাই মু'তাকিফকে এমন কোন কাজকর্ম বা আচার আচরণ করা উচিত নয় যাতে তার এ সাধনা ব্যহত হয় বা প্রশ্নবিদ্ধ হয় অথবা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় বা তার মনোবাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন তাপস সাধকের ন্যায় একাগ্রতা ঐকান্তিকতা শৃঙ্খলা ও পবিত্রতার লাগাম যেন হাত ছাড়া হতে না দেন।

মু'তাকিফ কি কি প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে যেতে পারেন

কৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মু'তাকিফ মসজিদ থেকে বাইরে যেতে পারেন না।

মু'তাকিফ মানবীয় প্রয়োজন যেমন প্রস্রাব পায়খানা প্রভৃতি ছাড়া মসজিদের বাইরে যাবেন না। এমন মসজিদে ই'তিকাফে বসা উচিত যেখানে বাজামাত নামায হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখনই আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঘরে আসতাম এবং ঘরে কোন রুগী থাকতো তখন হাঁটতে হাঁটতে কুশল জিজ্ঞেস করে নিতাম। মহল্লার মসজিদে ই'তিকাফে যিক্‌রে ইলাহী দোয়া দুরূদ ও নফল ইবাদতে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা উচিত। বেহুদা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক (সূত্র ঃ ফিকাহ্ আহমদীয়া)

লায়লাতুল কদর

লায়লাতুল কদর বা সৌভাগ্য রজনী লাভ বোধ করি মু'মিনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। সারা জীবন কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে শয়তানী প্রবৃত্তিরূপে দৈত্যকে নিধন করার পর মু'মিনের কাছে আসে সেই মুহূর্তটি-সেই পাওয়ার মুহূর্তটি যা আল কুরআনের সূরা ক্বাদরে 'লায়লাতুল কদর' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এ মুহূর্তটি। হাজার মাস অর্থাৎ প্রায় ৮০ বছর। একজন মু'মিন সাধারণত ৮০ বছর বেঁচে থাকেন। সুতরাং তারা সারা জীবনের সাধনার ফল লাভের মুহূর্তটি যে তার গোটা জীবনের চেয়েও কদরের তথা কল্যাণের ও মর্যাদার তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লায়লাতুল কদর বলতে সাধারণভাবে একটি রাত মনে করা হয়ে থাকে। ভৌগলিক কারণে সারা দুনিয়ায় যেহেতু একই সময়ে রাত থাকে না সেজন্যে লায়লাতুল কদরকে আমাদের গণনার একটি রাত নির্ধারণ করা সঠিক বলে মনে হয় না। লায়লাতুল কদর এমন একটি সময় মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় তথা মিল্লাতী জীবনে রাতের ন্যায় কাজ করে থাকে। গভীর নিশীথে প্রেমিক প্রেমিকা যেমন দুনিয়ার সবার অগোচরে চুপিসারে অভিসারে মিলিত হয় তেমনি মু'মিন সাধনার শেষ লগ্নে তার প্রভুর দিদার বা দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে বাক্যালাপে ভূষিত হয়। এ মুহূর্তটিই আসলে তার জীবনে লায়লাতুল কদর। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ মুহূর্তটি অবশ্যই মু'মিনের জীবনে আসে রমযানের কঠোর সাধানার শেষ দশকে। আগেই বলেছি, রোযার সাধনার মাধ্যমে মু'মিন পানাহার ত্যাগ করে, নিদ্রাকে কম করে দিয়ে এবং নিজের প্রজননকে সাময়িকভাবে হলেও অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়। তাই সে আল্লাহ্‌র সাথে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী বাক্যালাপ করার সৌভাগ্য লাভ করে। এর ইঙ্গিত আমরা কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ১৮৭ আয়াতে পেয়ে থাকি। সুতরাং সেই মুহূর্তটি প্রত্যেক মু'মিন জীবনের জন্যে অতি কদরের-অতি আদরের। উল্লেখ্য, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও রমযানের শেষ দশকেই আল কুরআনের মহান বাণী লাভ করেছিলেন। এটা ছিল ২৪শে রমযান (জারীর)।

নবী করীম (সাঃ) এ মুহূর্তটিকে বুঝানোর জন্যে তাঁর উম্মতকে এটা অনুসন্ধানের জন্যে বিভিন্ন সময়ের কথা বলেছেন। এটা রমযান মাসে, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় দিনে, রমযানের ২৭ তারিখে অন্বেষণ কর। হাদীস পাঠে জানা যায়, হযরত ওবায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত রসূল করীম সাল্লল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কদরের রাত সম্বন্ধে আমাদের জানাবার জন্যে এলেন। তিনি বললেন,

"আমি কদরের রাত সম্পর্কে তোমাদের জানাবার জন্যে এসেছি। কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করাতে তারিখটি আমি ভুলে গেছি" (বুখারী)। যে মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর উম্মতের হেদায়াতের খুঁটিনাটি কিছুই বর্ণনা করতে ভুলেন নি অথচ দু'টি লোকের ঝগড়াতে লিপ্ত হওয়ায় এমন এক মহামূল্যবান বিষয় সম্পর্কে ভুলে গেলেন এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা চাইলেন, সেই শুভ মুহূর্তটি পাওয়ার জন্যে সবাই যেন আজীবন চেষ্টা করে। আর যে চেষ্টা করবে সে অবশ্যই পাবে। সেই মুহূর্তটি যদি নির্ধারিতভাবে সবার জানা থাকতো তাহলে সারা জীবন সাধনার প্রয়োজনই থাকতো না। কেবল সেই নির্দিষ্ট সময় চেষ্টা করলেই চলতো। আর এভাবে সেই মুহূর্তটির কোন মাহাত্ম্য ও কদরই থাকতো না।

প্রায় হাজার বছরের বক্রযুগের অন্ধকার যামিনীর শেষ লগ্নে শুভ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে ও ইসলামের বিশ্ববিজয়ের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা দীর্ঘ অমানিশার ঘোর অন্ধকারের পর চতুর্দশী পূর্ণশশীসম হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পুনরায় এক লায়লাতুল কদরের যুগ আমাদের জন্যে –আহমদীয়া জামাতের জন্যে তোহফাস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এ যুগের ইবাদত বন্দেগী জেহাদ-মোজাহেদা, সাধ্যসাধনা অন্ধকার যুগের চেয়ে বেশি কদর লাভের যোগ্য। আমাদের সবার এ যুগের কদর করে ধন্য হওয়া আবশ্যক।

এ ছাড়া সূফীরা লিখেছেন, রাত ছাড়া অন্য সময়েও লায়লাতুল কদর সংঘটিত হতে পারে। তবে রমযানের শেষ দশকের রাতগুলোতে কবুলিয়তের বিশেষ মুহূর্ত এসে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ অভিজ্ঞতায় বলেন, '২৭ তারিখ রাতে এ মুহূর্ত এসে থাকে' (আল ফযল, ৩/১১/১৯১৪)। কারও এ মুহূর্তটি লাভ হলে তার কি করা উচিত–এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে জানা যায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি লায়লাতুল কদর লাভ করলে কি করবো? নবী করীম তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে বললেন। **"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু 'আন্নি"** অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী। মার্জানাকে তুমি ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে মার্জনা কর (তিরমিযী)। রমযান মাসের শেষ দিনগুলোতে সবার বেশি বেশি এ দোয়া করা উচিত।

ঈদুল ফিতর

পবিত্র রমযান মাসের পর পহেলা শাওয়াল তারিখে রোযার কল্যাণ লাভের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈদের আনন্দ উদযাপন করা হয় সারা মুসলিম বিশ্বে। এমনিভাবে ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে ঈদুল আযহিয়ার ঈদ পালন করা হয় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানীকে স্মরণ করে। সুতরাং মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হিসেবে এ দু'টি ঈদ সম্পর্কেই জানা যায়। নবী করীম (সাঃ)ও বলেছেন, এ দু'টিই আমাদের ঈদ। ঈদ মুসলমান নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ গরীব-ধনী সবার জন্যে আনন্দের সওগাত বয়ে নিয়ে আসে। এটা সবার একটি সম্মিলিত আনন্দানুষ্ঠান।

ঈদের দিনে করনীয়

ঈদের দিন সকাল বেলা গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সম্ভব হলে নতুন কাপড় চোপড় পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, উত্তম খাবার খাওয়া, ফিতরানা আদায় করা এবং **আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ** অর্থ ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব প্রশংসা আল্লাহ্রই–

এই তকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহে বা মসজিদে নামায পড়তে যাওয়া সুন্নত। ঈদের নামাযের পর এবং আগে ও পরে যতক্ষণ ঈদগাহে অবস্থান করা হয় ততক্ষণও এ তকবীর পাঠ করা আবশ্যক। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার আগে ২ রাকাত সুন্নতে মুয়াকাদাহ্ নামায আদায় করা আবশ্যক। নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নত থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, তিনি এক পথ দিয়ে ঈদের নামাযের স্থানে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ঘরে ফিরতেন যাতে বেশি বেশি মু'মিন তাঁর (সাঃ) সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন (ইবনে মাযাহ, পৃষ্ঠা ৯৩,তিরমিযী পৃষ্ঠা, ১১)।

সাদাকাতুল ফিতর প্রসঙ্গ

সদকাতুল ফিতর বা ফিতরানা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে রমযান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দান খয়রাত সম্বন্ধে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) সবার চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর রমযানে তাঁর দানশীলতা আরও বেগবান হতো। এ দিন গুলোতে তিনি (সাঃ) তীব্র ঝড়ের বেগের চেয়েও অধিক বেগে দান-খয়রাত করতেন।

সুতরাং রমযান মাসে আমাদের বেশি বেশি দান খয়রাত করা উচিত। বিশেষ করে লাজেমী চাঁদাগুলো এবং তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাগুলো আর দান খয়রাতের মাধ্যমে গরীবের দুঃখ দুর্দশা মোচনের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রকৃষ্ট সময়-এ মাসই। কেননা, রোযা রেখে আমরা ক্ষুৎ পিপাসার কষ্ট হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারি।

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরানা সম্পর্কে হাদীসে নির্দেশ এসেছে, এটা সব মুসলমানের পক্ষ থেকে আদায় হওয়া জরুরী। ছোট হোক বা বড়। এমনকি ঈদের নামাযের আগে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছে তার পক্ষ থেকেও ফিতরানা আদায় করার দায়িত্ব শিশুর অভিভাবকের। যিনি ফিতরানার অংশ পাবেন তাকেও আগে এ ফান্ডে ফিতরানা জমা করতে হবে। ফিতরানা রোযাদারের বৃথা ও নোংরা জিনিষ থেকে পবিত্র হবার মাধ্যম। তাছাড়া অভাবী লোকেরা যাতে

সবার সাথে ঈদের খুশীতে অংশ নিতে পারে এজন্যে ঈদের আগেই জামাতী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের হাতে এ ফান্ড থেকে অর্থ পৌঁছে দেয়া হয়ে থাকে । আহমদী জামাতেই কেবল বায়তুল মাল রয়েছে। তাই এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। অন্য কোথাও এটা দেখা যায় না।

রমযান আরম্ভ হওয়ার পরই ফিতরানা ওয়াজিব হয়ে যায়। জামাত থেকে প্রতি বছর ফিতরানার হার নির্ধারিত করে দেয়া হয়। এবার জামাত মাথা পিছু ৬০/- (ষাট) টাকা হারে ফিতরানা নির্ধারণ করেছে। যারা অপারগ তারা অর্ধেক হারে এটা আদায় করতে পারেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহেঃ) অভাবীদের মাঝে ঈদের তোহফা বন্টনের এবং প্রভাবশালীরা যাতে গরীব ভাইদের বাড়ীতে ঈদের সাক্ষাৎ করার জন্যে যান-এর প্রচলন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

ঈদফান্ড প্রসঙ্গ

ঈদফান্ডে চাঁদা দেয়া ঈদের দিনের একটি বিশেষ করণীয়। এ ফান্ড হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় থেকে প্রচলন করা হয়েছে। ইসলামের বিধান এরূপ যেন প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করেই তার খুশীর প্রকাশ ঘটান। মু'মিনের আনন্দের বহির্প্রকাশ ঘটে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মাধ্যমে। শুধু মৌখিক ঘোষণাই যথেষ্ট নয় এজন্যে দুই ঈদেই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে যেমন তকবীর পাঠ করা হয় তেমনি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার চরম বিকাশ ঘটবে সারা বিশ্বে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলেই। তাই এ চাঁদা ইশাআতে ইসলাম বা ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় ঈদ উপলক্ষ্যে প্রত্যেক উপার্জনক্ষম আহমদীর কাছ থেকে ১.০০ (এক) টাকা হারে এ চাঁদা আদায় করা হতো। বর্তমানে সেই শতবর্ষ আগের তুলনায় টাকার মূল্যমান যে অনেক কমে গেছে তা সবাই স্বীকার করবেন। তাই এখন প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এ ফান্ডে চাঁদা দেয়ার জন্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঈদের দিন এ চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ঈদের দিনের আগেও এ চাঁদা আদায় করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াককিদা। যথারীতি দুই রাকাআত তকবীর বাদে প্রথম রাকাআতে তিলাওয়াত আরম্ভ করার আগে ৭ বার এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ৫ বার করে অতিরিক্ত তকবীর দিতে হয়। (তিরমিযী কিতাবুস সালাত, পৃষ্ঠা ৭০)। তকবীরের সাথে সাথে হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হয় এবং পরে ছেড়ে দিতে হয় এরপর তা'আউয, তাসমীয়া ও ক্বিরাত আরম্ভ করতে হয়। ইমাম সাহেব প্রথমে ২ রাকাআত নামায পড়াবেন পরে খুতবা দিবেন এবং খুতবা সানীয়ার পর সম্মিলিত দোয়া করাবেন। এরপর সবাই সালাম বিনিময় ও কোলাকোলি করবেন। এভাবে ঈদের অনুষ্ঠান পূর্ণতায় পৌঁছবে।

সবশেষে ঈদের তাৎপর্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত উপলব্ধি বর্ণনা করে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি ঃ পবিত্র মাহে রমযানের রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের দশকত্রয় একে একে চলে যায়। আর পবিত্র ঈদুল ফিতরের এক ফালি বাঁকা চাঁদ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে ডেকে বলে আস, ঈদ কর। আনন্দ স্ফূর্তি কর। কিন্তু এ আনন্দ স্ফূর্তি কিসের তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ আনন্দ কি নতুন জামা কাপড় পড়ার এবং সেমাই জর্দা খাওয়ার নাকি রোযার বোঝা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে সেজন্যে। নাকি বড় লোকেরা দামী দামী কাপড় চোপড় পরিধান করে ঈদের খুশীতে আনন্দে ভরপুর হয়েছে আর কতগুলো লোক নগ্নদেহে ভগ্ন স্বাস্থ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে আর বলছে মাগো! খাবার দিবেন, ফেতরা দিবেন এজন্যে? নাকি এজন্যে যে, পবিত্র আরব ভূমি ইহুদী নাসারা কর্তৃক দলিত মথিত হচ্ছে, অথবা প্যালেষ্টাইনের মুসলমানগণ ইহুদী চক্র কর্তৃক নিগৃহিত হচ্ছে বা মুসলমানরা আপসে লেবানন ও আফগানিস্তানে নিজেরা পুড়ছে অথবা নীরিহ ইরাকী মুসলমানদের রক্তে ইরাকের মাটি রঞ্জিত হচ্ছে? খুব গভীরভাবে ভাবতে গেলে এ খুশী কি এরকম নয় যে, কারও ঘরে মরা লাশ পড়ে আছে আর তারা আনন্দ স্ফূর্তিতে মশগুল।

'ঈদ' অর্থ–যে খুশী ও আনন্দ বার বার আসে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে মুসলমানগণও এক ধরনের ঈদ আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু বক্র ও পথভ্রষ্টতার যুগে সত্যিকার খিলাফত হারিয়ে সত্যিকার ঈদ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে। মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়তে'র পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারি। এ খিলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও যেমন করা হয়েছে, তেমনি এর মাধ্যমে মুসলমানগণ দ্বিতীয়বার প্রকৃত ঈদের আস্বাদন গ্রহণ করবে এ কথাও জানা যায়। আল্লাহ্‌র ফযলে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে সে কর্মকান্ড আরম্ভ হয়েছে। আজ বিশ্ব মুসলিম যত শীঘ্র এ ঐশী কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করবে ততশীঘ্র তারা সেই প্রতিশ্রুত প্রকৃত ঈদকে প্রত্যক্ষ করবে। দুনিয়াতে সত্যিকার অর্থে আবার আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন ধর্ম বলতে কেবল ইসলামকেই বুঝাবে এবং ধর্মীয় নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে। সেই প্রকৃত ঈদ প্রত্যক্ষ করার আশায় আমরা অপেক্ষমান। আল্লাহ্ করুন আমাদের জীবনেই আমরা যেন এর সৌভাগ্য লাভ করি।

–আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রত্যেহ কুরআন পাঠের ফযিলত

কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। এটি মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী এবং হেদায়েত ও উপদেশ স্বরূপ। কুরআন মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করেন। এর মর্যাদা সর্বোচ্চে। এর একটি সূরার অনুরূপ সূরা মানুষের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। কুরআন সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। এটি মুমেনের জন্য শেফা (আরোগ্য) দানকারী এবং মুমেনগণের জন্য হেদায়াত স্বরূপ ও পথপ্রদর্শক। কুরআন মানবজাতিকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে আনে। এটিকে বেশি বেশি তেলাওয়াত করা ও আমল করা প্রত্যেকের জন্য জরুরী। প্রত্যহ কুরআন পাঠের ফযিলত সম্পর্কে কিছু লিখতে চেষ্টা করছি–**'রাব্বি জিদনী ইলমান'**।

সূরা বনি ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **"আকিমিস্‌সালাতা লিদুলুকিস্ শাম্‌সি ইলা গাসাকিল লায়লি ওয়া কুরআনাল ফাজরি। ইন্না কুরআনাল ফাজরি কানা মাসহুদা"**–অর্থাৎ তুমি সূর্য্য হেলিয়ে যাওয়ার পর হতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর, এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর। প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট) নিশ্চয় গ্রহণীয়।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা প্রভাতে অর্থাৎ ফজরের নামাযের পর কুরআন পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট গ্রহণীয় বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা সূরা মুয্‌যাম্মিলের ৫নং আয়াতে বলেন, **আও যিদ আলায়হি ওয়া রাত্তিলিল কুরআনা তারতিলা**–অর্থাৎ অথবা এর উপর কিছু বাড়াও এবং তরতীল সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি কর। এখানে যত্ন সহকারে আদরের সাথে সুন্দর করে সুর করে তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল আলাক এর ২ নং আয়াতে বলেন, **ইকরা' বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযি খালাক্ব**। অর্থাৎ তুমি পাঠ কর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সূরা জুমআ-এর ২৪নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করেছেন। যার আয়াতসমুহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। এটি (পাঠের) কারণে তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তৎপর তাদের দেহ ও তাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণে নরম হয়ে পড়ে। এটি আল্লাহ্‌র হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি যাকে চান হেদায়াত দেন। এবং যাকে চান আল্লাহ্ বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন এমন ব্যক্তির জন্য কেউই হেদায়াত দাতা নাই।

কুরআন হলো সর্বোত্তম কিতাব। যারা আল্লাহকে ভয় করে ও সৎ কাজ করে তারা এই কিতাব পাঠে হেদায়াত পাবেন কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে না তাকে হেদায়াত দান করার কেউই নেই। এই কিতাব বার বার পাঠ করার মাধ্যমে মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের নীতিমালা ও শিক্ষাসমূহ আয়ত্ত করতে পারে। পূর্ণতম কিতাবরূপে কুরআনে সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রত্যহ পবিত্র কুরআন পাঠ করে তাদের জীবন সাবলীল, সুন্দর, সমৃদ্ধশালী ও পবিত্র হয়।

সূরা আল ফাতের আয়াত নং ৩০ এ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, অর্থ–নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে। তারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যা কখনও বিফল হবে না।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করবে, নামায কায়েম করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা যা দিয়েছেন তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করবে তারা আল্লাহ্ তাআলার সাথে এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যা কখনও বিফল হবে না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে বেহিসাব রিযিক দান করবেন।

এখন চলুন আমরা দেখি প্রত্যহ কুরআন পাঠের ব্যাপারে হযরত রসূল করীম (সাঃ) কি বলেছেন ঃ

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "কুরআন পাঠ কর কেননা বিচার দিবসে তা পাঠকের শাফায়াতকারী হবে" (মুসলিম)।

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়" (বুখারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন–"সে আমাদের দলে নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না বা কুরআন পেয়েও সবকিছু থেকে বিমুখ হয় না" (বুখারী)।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে পেটে কুরআনের কিছুই নেই তা খালি ঘর তুল্য" (তিরমিযী)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, "কুরআন পাঠকারী হাফেযের দৃষ্টান্ত হলো, সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফিরিশ্‌তাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হিফ্‌য করা তার জন্য কষ্ট হলেও তা হিফজ করে। সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে"। (বুখারী কিতাবুত তফসীর)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন "কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাকো। (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকো)। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন–একদা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বলেছিলেন, "অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে যখন তাতে পানি লাগে। তাঁকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তা পরিস্কার করার উপায় কী? হুযূর (সাঃ) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত" (মেশকাত)।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন "যে কুরআন পড়েছে এবং একে মুখস্ত রেখেছে, অতঃপর তার হালালকে হালাল

এবং হারামকে হারাম জেনেছে তাকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে দাখিল করবেন।" (তিরমিযী)।

হযরত মুয়াজ জুহানী (রাঃ) বলেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন. "যে ব্যক্তি প্রত্যহ কুরআন পাঠ করেছে এবং এতে যা আছে এর ওপরে আমল করেছে, তার মা বাপকে কিয়ামতের দিন এমন এক তাজ পড়ানো হবে যার কিরণ সুর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে" (আহমদ আবু দাউদ)।

* হাদীসে আছে–রসূল করীম (সাঃ) বলেন, যে মুমেন প্রতিদিন কুরআন পাঠ করেন তার দৃষ্টান্ত হলো কস্তুরীর মত যার সুগন্ধি আছে–স্বাদও আছে।
* যে মুমেন প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে না তার স্বাদ খেজুরের মত–যার স্বাদ আছে কিন্তু ঘ্রান নেই।
* যে মুনাফেক প্রতিদিন কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত রায়হান ফুলের মত যার সুগন্ধ আছে কিন্তু স্বাদ তিক্ত।
* যে মুনাফেক কুরআন পাঠ করে না তাঁর দৃষ্টান্ত বাবুল কাঁটার মত তার কোন স্বাদ নেই উপকারীতাও নেই (মুসলিম শরীফ)।

প্রত্যহ কুরআন পাঠের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'প্রত্যহ' গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করবে। কুরআনকে এক অনাবশ্যক দ্রব্যের মত ফেলে রেখো না, কুরআনেই তোমাদের জীবন রয়েছে। যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে। খোদা তাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন–**সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে।** এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই যা কুরআন শরীফে নাই। 'কেয়ামতের' দিন ঈমানের সত্যাসত্যের মানদন্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হবে। কুরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যা তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেছেন যে কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা যদি খৃষ্টানদেরকে দেওয়া হতো তবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না। এই যে নেয়ামত ও হেদায়াত তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা যদি ইহুদীদেরকে তওরাতের স্থলে দেওয়া হত তবে তাদের কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হত না'।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, 'যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্ন না থাকে তবে কুরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কুরআন শরীফ হতে বিমুখ না হও তবে তা তোমাদেরকে নবী সদৃশ করতে পারে। কুরআন শরীফ পাঠককে সর্বপ্রথমেই এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছে এবং এই আশা দিয়েছে যে– **ইহ্‌দিনাস্ সীরাতাল মুসতাকিম সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম**–অর্থাৎ আমাদেরকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর, যা পূর্ববর্তীদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছে, যাঁরা নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ ছিলেন"। সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করো না। কারণ তা তোমাদেরকে ঐ সকল আশিস প্রদান করতে চায় যা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, খোদা তাআলা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদেরকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন। কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী কেউই হবে না, খোদা তাআলা তোমাদেরকে ওহী, ইলহাম খোদা তাআলার সাথে বাক্যালাপ হতে কখনও বঞ্চিত রাখবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল অনুগ্রহ প্রদান করেছিলেন তদসম্পদ তিনি তোমাদেরকে প্রদান করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতঃ খোদা তাআলার প্রতি বাক্যালাপের কথা মিথ্যা বলবে আমি তদ্রুপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদা তাআলার এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লংঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআনেই রয়েছে' (কিশতিয়ে নূহ)।

পাঠক মহোদয়, আমাদের কষ্ট করে হলেও কুরআন পাঠের জন্য সময় বের করে নিতে হবে। আর কুরআন তেলাওয়াতের জন্য সময় বের করা তখনই সহজ হবে যখন আমরা কুরআন তেলাওয়াতে স্বাদ পেয়ে যাব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব কাজই কিন্তু আমরা করি, আর এমন কাজও আমরা করে থাকি যার ফল শূন্য! কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের সময় বের করে নিলে আমরা পুরোপুরিই লাভবান হবো। কুরআনের প্রতি যদি আমাদের সত্যিকার ভালবাসা থাকে তবে অবশ্যই আমাদের কাছে সময় কোন বিষয় হবে না। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হবে। যারা কর্মক্ষেত্রে কাজ করেন তারা ফজরের পরে ২/৩ আয়াত পড়ে নিবেন তাও সময় না হলে মুখস্থ পড়তে থাকবেন ও কাজ করবেন। তারপর আপনার ব্যাগে ছোট একখানা কুরআন শরীফ রাখতে পারেন। কাজের ফাঁকে আড্ডা না দিয়ে ১০ মিনিট পড়ে নিতে পারেন। গাড়ীতে বসেও আপনি পড়ে নিতে পারেন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ আপনি তেলাওয়াত করতে পারেন। যারা জীবনে যত বড় হয়েছেন তারা সকলেই আল কুরআনকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

বন্ধুগণ! চলুন আমরা সকলেই প্রত্যহ কুরআন পাঠে মনোযোগী হই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে কুরআন পাঠ ও আমল করার তৌফিক দিন। আমীন, সুম্মা আমীন!

ডা. পারভীন হাকিম আনোয়ার
মিরপুর

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জীবনাদর্শের এক ঝলক

সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ।

রাব্বি জিদনী ইলমা, রাব্বি আল্লেমনি মাহুয়া খাইরুন ইন্দাকা। রাব্বি আরেনী আনওয়ারাকা কুল্লিয়াতান। রাব্বি আরেনি হাকায়েকাল আসইয়ায়ে।

মধুর পারিবারিক সম্পর্ক ঃ

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ওয়া আশেরুহুন্না বিল মারুফে"** অর্থাৎ নিজ পরিবারের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রসূল করীম (সাঃ)ও ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজ পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাকে এবং আমিও নিজ পরিবারের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে থাকি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী তাঁর (আঃ) পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খুবই নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন, মূল কথা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পারিবারিক জীবন একটি বেহেশ্‌তী জীবন ছিল। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বাড়িতে যে সব মহিলা কাজ করতেন, তারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে বলাবলী করতো, "মির্যা সাহেব তাঁর সহধর্মীনির কথা খুবই মান্য করেন।"

চাকরদের সাথে সদ্ব্যবহার ঃ- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ বাড়ীর চাকরদের সাথে সর্বদাই উত্তম ব্যবহার করতেন। কোন ত্রুটি হলেও তিনি তাদেরকে তিরস্কার বা মারধর করতেন না। চাকরদের তিনি আপনি বলে সম্বোধন করতেন এবং একই দস্তরখানে তাদের সঙ্গে বসে খানা-পিনা করতেন। একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কোন কাজে একজন চাকরসহ বাটালা গিয়েছিলেন, তখন কাদিয়ান থেকে বাটালা যাওয়ার জন্যে ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন যানবাহন ছিল না। তিনি ঘোড়ায় রওনা হলেন এবং পথিমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং চাকরকে ঘোড়ায় চড়তে বললেন, তখন চাকর অসম্মতি জানালে , তিনি বললেন, "আমার হাটতে ভাল লাগে, আপনি ঘোড়ায় উঠুন, এভাবে বাটালা পর্যন্ত যেতে অধিক পথই তিনি হেটে গেলেন এবং চাকর ঘোড়ায় চড়ে গেল। বাটালা পৌঁছে তিনি ভৃত্যকে চার আনা পয়সা খাবার খাওয়ার জন্য দিলেন এবং নিজের জন্য এক আনার ডাল রুটি ও ভুনা ছোলা এনে খেলেন।

একবার একজন কাজের মেয়ে কিছু চাল চুরি করে ধরা পড়ল। বাড়ির লোকেরা তাকে গালমন্দ দিয়ে লাঞ্ছিত করার উপক্রম করলো, এমন সময় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। তিনি হৈ-হল্লা শুনে কি হয়েছে জানতে চাইলেন, তখন তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনা জানানো হলে হুযূর (আঃ) বল্লেন, "তাকে লাঞ্ছিত করো না, তাকে ছেড়ে দাও, মেয়েলোকটি অভাবী, বরং তাকে আরো কিছু চাল দিয়ে দাও যেন তার সন্তানদের খাওয়াতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর সংসারের বৈষয়িকতার প্রতি উদাসিনতা ঃ সংসারের প্রতি উদাসিনতা ও বৈরাগ্য মনোভাব লক্ষ করে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে তিরস্কার করে বলতেন যে, আমাদের সম্মানিত বংশে কেমন করে এক মোল্লা সৃষ্টি হয়ে গেল। ভবিষ্যতে তার কি দশা হবে? সে খাবে কী? ইত্যাদি। তবে তাঁর পিতা মাঝে মধ্যে মোল্লা বলা সত্ত্বেও কখনো কখনো হযরত (আঃ) এর ধর্মপরায়ণতার প্রশংসা করে এও বলতেন–প্রকৃতপক্ষে এ ছেলের জীবনই পবিত্র জীবন। কেবল দুনিয়া দুনিয়া করে মূল্যবান জীবনই বরবাদ করলাম অথচ পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য কোন প্রস্তুতি নেইনি।

কর্মদক্ষতা ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কোন কোন বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকলেও তাঁর মনের গতি সর্বদাই ইবাদতের প্রতি আর যিকরে ইলাহির দিকেই ধাবমান থাকত। কদাচিত কোন জরুরী কাজের তাগিদে কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন বটে কিন্তু সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী এবং আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল। তিনি নির্জনতা ও নিরিবিলি জীবন পছন্দ করা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। দৈনিক ৫/৭ মাইল প্রাতঃভ্রমণ করতেন, দৈনন্দিন জীবনে অধিকাংশ সময়ই মসজিদে কাটাতেন, কুরআন পাঠ, যিকরে ইলাহী ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

দরবেশী চরিত্র ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর রুইয়া, কাশফ, ইত্যাদি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেত। হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকেরাই এক বাক্যে তাঁকে (আঃ) একজন জবরদস্ত 'ওলীআল্লাহ্' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং অতি শ্রদ্ধাভরে তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন।

জনসেবা ঃ হযরত আহমদ (আঃ) এর অন্তরে সর্বদাই জনসেবার প্রেরণা বিরাজ

করত, শিয়ালকোটে অবস্থানকালে চাকুরীর বেতন স্বরূপ তিনি যা পেতেন তাথেকে নিজের খোরাকী ইত্যাদি বাবদ মামুলি খরচ রেখে অবশিষ্ট টাকা শিয়ালকোট শহরের ঐ মহল্লাতে বসবাসরত বিধবা, এতিম ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন।

স্বপ্নে আঁ-হযরত (সাঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ ঃ হযরত আহমদ (আঃ) বর্ণনা করেন, আমার যৌবনের প্রারম্ভে একরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে জাঁকজমকপূর্ণ এক বাড়িতে আমি অবস্থান করছি। বাড়িটা অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আর এ বাড়িতেই আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে চর্চা হচ্ছিল। হুযূর (সাঃ) কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে কতিপয় লোক আমাকে একটি কামরার দিকে ইশারা করলেন, ভিতরে প্রবেশ করে হুযূরের (সাঃ) খেদমতে পৌঁছলে হুযূর (সাঃ) আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, হুযূর (সাঃ) আমার সালামের অতি উৎকৃষ্ট উত্তর প্রদান করলেন। খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর রূপ, সৌন্দর্য, কমনীয়তা এবং তাঁর (সাঃ) স্নেহমাখা দৃষ্টি আমার এখনও স্মরণ আছে। তিনি আমাকে স্নেহমাখা আওয়াজে বল্লেন, "আহমদ তোমার ডান হাতে কি রয়েছে? আমি নিবেদন করলাম "হুযূর (সাঃ) এটি আমার রচিত একটি গ্রন্থ। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন এর কি নাম রেখেছ? এই অধম নিবেদন করলাম, এই কিতাবের নাম আমি 'কুতবী' রেখেছি। হুযূর (সাঃ) স্নেহভরে কিতাবটি আমার কাছ থেকে নিলেন, কিতাবটি নবী করীম (সাঃ)-এর হস্ত মোবারকের স্পর্শ লাগামাত্র পেয়ারার ন্যায় একটা মনোরম সুন্দর ফলে পরিণত হয়ে গেল। কিন্তু আকারে তরমুজের সমান ছিল। নবী করীম (সাঃ) যখন এই ফলটি বিতরণের উদ্দেশ্যে কাটলেন তখন তা থেকে এতই মধু নির্গত হলো যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র হাত কনুই মোবারক পর্যন্ত মধুময় হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক মৃত ব্যক্তি যিনি দরজার বাইরে পরেছিলেন, হুযুর (সাঃ)-এর মোজেযায় জীবিত হয়ে এই অধমের পিছনে এসে দাঁড়ালো। আঁ হযরত (সাঃ) উপরোক্ত ফলটির একটি টুকরো এ উদ্দেশ্যে আমাকে প্রদান করলেন যেন আমি তা সেই পূণর্জীবিত ব্যক্তিকে প্রদান করি, বাকী টুকরোগুলো হুযূর (সাঃ) আমার বস্ত্রাঞ্চলে সমর্পণ করলেন, আমি সেই টুকরাটি ঐ নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিলাম। সে তা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করল, আমি দেখলাম, এর ফলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আসন উর্দ্ধে উত্থিত হয়ে ছাদ স্পর্শ করল। আমি দেখলাম, তখন তাঁর পবিত্র চেহারা এরূপ দীপ্তিময় হয়ে উঠল যেন তার উপর সূর্য ও চন্দ্রের আভা নিপতিত হয়েছে। আমি আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁর পবিত্র চেহারার প্রতি চেয়ে রইলাম এবং আমার অশ্রুপাত হতে লাগল। তারপর আমি জাগ্রত হলাম। তখনও আমি কাঁদছিলাম এবং আল্লাহ্ তাআলা আমার হৃদয়ে সংকেত করলেন যে, সেই মৃত ব্যক্তি ইসলাম এবং আল্লাহ্ তাআলা একে আঁ হযরত (সাঃ)-এর রূহানী কল্যাণে এখন আমার হাতে সঞ্জীবিত করবেন।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া বারেক ওয়াসাল্লিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

মিসেস মাহমুদা ইসলাম
মিরপুর

হৃদয়ে আহমদীয়াত

৭০০ কোটি মানুষের জুতা দিয়ে
মালা বানিয়ে আমার গলায়
পড়িয়ে যদি
সারা পৃথিবী ঘুরানো হয়,

সবগুলি মানুষ যদি
আমাকে ঘৃণা করে
থু থু ফেলে,

সমস্ত পৃথিবী যদি
মাথায় তুলে দেওয়া হয়
যদি ভারে মাটিতে মিশে
একাকার হতে হয়

যদি হাজার বার জীবন নিয়ে
হাজার বার জ্বলে মরতে
হয়,
সব সমুদ্রের জল বিষ বানিয়ে
যদি সব বিষ আমাকে
খাওয়ানো হয়

যদি হাজার বছর ধরে
বর্শা তীরে আমার বুক
ঝাঝরা করা হয়,

আমি শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত
বজ্রনিনাদে ঘোষণা করব
আমি আহমদী, আমি
আহমদী
(আমারই ছাত্ররা আমাকে দেখে
জুতাপেটা করার কথা বলায়)

–দেলোয়ার হোসেন

তরবিয়তে আওলাদ

সন্তানদের উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকাই মূখ্য

'তরবিয়তে আওলাদ'-এর দুটো অংশ রয়েছে, একটি হলো 'তরবিয়ত' অন্যটি হলো 'আওলাদ'। 'তরবিয়ত' কথাটির অর্থ হলো আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ট্রেনিং যা কিনা মানুষের সার্বিক চরিত্র গঠন করে আর 'আওলাদ' কথাটির অর্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি বা ছেলে মেয়ে। তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারছি তরবিয়তে আওলাদ হচ্ছে আমাদের ছেলে-মেয়েদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ট্রেনিং সম্পর্কিত বিষয়। ইলাহী জামাতে তালীম তরবিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে লক্ষ লক্ষ লোক বয়াত নিচ্ছে। তাই তালীম তরবিয়তের বিষয়টাকে আমাদের খাটো করে দেখলে চলবে না।

যেহেতু ছেলে মেয়েদের আচার আচরণ ও সার্বিক চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয়ে যায়। সেজন্য জন্মের পরে মাতাপিতা, ভাইবোনদের সাথে থাকার কারণে তাদের ব্যবহার, চালচলন শিশুরা অনুকরণ করতে থাকে। সেজন্য তাদের গুণাবলী শিশুদের মধ্যে সকলের অজান্তে প্রবেশ লাভ করতে থাকে। এই কারণে নেক পরিবারের সন্তানাদিরা নেক হয় এবং অসৎ পরিবারের সন্তানাদি অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ছেলে মেয়েরা যখন বাইরে যাওয়ার বয়সে পৌঁছে তখন বাইরের ছেলে মেয়েদের সাথে মিশে তারা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অপরকেও প্রভাবিত করে। তখন আমরা যারা পিতা মাতা বা অভিভাবক রয়েছি তাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত যে আমাদের ছেলে মেয়েরা কি ধরনের ছেলে মেয়েদের সাথে মেলামেশা করছে।

বর্তমান নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে তরবিয়তে আওলাদ ও সুসন্তান গড়ে তোলার বিষয়টি খুবই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা করা যাবে না।

আল কুরআনের সূরা কাহাফের ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "ধন সম্পদ সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।" আবার এই সন্তান-সন্ততি যদি আদর্শ চরিত্রের না হয় তাহলে তারা মা বাবার জন্য পরীক্ষার কারণ ও দুঃখের বোঝা, আর এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে, সুরাতুল আনফালের ২৯ নং আয়াতে মুমিনগণকে হুঁশিয়ার করে বলেছেন "এবং জেনে রাখবে তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি পরীক্ষার কারণ"। অর্থাৎ হে আমার বান্দা সন্তান-সন্ততির আশা আকাঙ্খা তোমরা অবশ্যই করে থাকো কিন্তু তাদেরকে যদি মানুষের মত মানুষ না বানাও এবং আমার প্রিয় বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে না পারো তাহলে এ সন্তান-সন্ততিরা তোমাদের নয়ণ মনি হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের চোখের কাঁটায় পরিণত হবে, তোমাদের বহু দুঃখ কষ্টের কারণ হবে, তোমাদের জন্য জাহান্নামের ইন্ধন! তাই আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে হুশিয়ার করে সূরা তাহরীমের ৭নং আয়াতে আরও বলেছেন "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গদের আগুন থেকে বাঁচাও"–সন্তান-সন্ততিদের তরবিয়তের ব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক নসিহত করেছেন। সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে আমাদের নিজেদের দায় দায়িত্ব কতটুকু তা উপলব্ধি করতে হবে। এবং সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন "স্ত্রী নির্বাচনে মানুষ ৪টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে– (১) কেউ তার সৌন্দর্য দেখে (২) কেউ দেখে তার ধনসম্পদ (৩) কেউ তার বংশ বা আভিজাত্য দেখে এবং (৪) কেউ তার ধর্মপরায়নতার দিকে দৃষ্টি রাখে। তিনি (সাঃ) বলেছেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা ধর্মপরায়ণতাকে প্রাধান্য দাও নইলে তোমাদের হাত ধুলিমাখা থাকবে"। পূণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভের জন্য আঁ হযরত (সাঃ) এর উপরোক্ত হাদীস-এর উপর আমল করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব যে কত ব্যাপক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশির উদ্দিন আহমদ (রাঃ) বলেন,**পূণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভ করতে পূণ্যবতী মা থেকে বড় আর কোন যন্ত্র এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।** সুতরাং পূণ্যবান সন্তান-সন্ততি পাওয়ার জন্য বিবাহযোগ্য যুবকদের পূণ্যবতী যুবতীর অন্বেষণে এবং পুণ্যবতী যুবতীদের পুণ্যবান যুবকের অন্বেষণে থাকা প্রয়োজন। একজন ধর্মপরায়ণা সুশিক্ষিতা মা সঠিক পরিচালনা দ্বারা তার সন্তানকে আদর্শ ছেলে-মেয়ে হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। ছেলে মেয়ের জীবনে এবং নিজ পরিবারে এনে দিতে পারেন অনাবিল সুখ। মাতার এরূপ দায়দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মায়ের পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত" মায়েরা যদি এ বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে মায়ের উপর গৌরবময় এক গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মায়ের অনুশাসন ও শিক্ষা, স্নেহ-মায়া মমতায় সন্তান-সন্ততি পুণ্যবান হতে পারে। একজন জান্নাতি মা-ই তার পায়ের নীচে জান্নাত রচনা করতে পারে, তাহলেই

না তার সন্তানও জান্নাতি হবে। তাই একজন ধর্মপরায়ণা মায়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। দাম্পত্য জীবন যদি সুখের হয় তবেই বেহেশ্‌ত রচনা করা যেতে পারে। আর এ জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই মনমানসিকতা ও সমঝোতা। এক দেহ, এক মন ও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন মধুময় হতে পারে না।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আহমদী পুরুষগণকে অ-আহমদী মেয়ের সাথে এবং আহমদী মেয়েদেরকে অ-আহমদী পুরুষদের সাথে বিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। (ফতওয়ায়ে মসীহে মাওউদ (আঃ) ১৪৫ পৃষ্ঠা) সন্তানের তরবিয়তের ব্যাপারে মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, যদি এটি চান যে সন্তান ধার্মিক হোক তাহলে খোদা তাআলার ইবাদতকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করুন, যেন আপনার সন্তান-সন্ততিও ঐশী আদেশ পালন করে। হুযূর (আঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সন্তানের আকাঙ্খা এভাবে করতে বলেছেন–অর্থাৎ হে খোদা তাআলা স্ত্রীদের ও সন্তানদের থেকে আমাদের চোখের স্নিগ্ধতা দান করো এবং মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও। পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন "অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি দান করো" (সূরা সাফফাত ১০১ আয়াত) আমাদের সন্তান সন্ততিকে সঠিক তালীম তরবিয়ত দেওয়ার জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হল–সর্বপ্রথম দোয়া, তারপরে শিশুকে সত্য বলার অভ্যাস করানো, নামাযের প্রতি মনোযোগী করা, খোদা সম্পর্কে ধারনা দেওয়া, শিশুকে অল্পতে খুশি থাকা শিখানো, দান খয়রাত এবং মালী কুরবানীতে শিশুকে অংশগ্রহণ করানো, মাতৃভাষা শিখার পাশাপাশি বাল্যকাল থেকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া। ছেলে মেয়েদেরকে সব সময় ভাল ছেলে মেয়েদের সাথে মেলা মেশার সুযোগ করে দেওয়া। জামাতের অঙ্গসংগঠন সমূহের সাথে বাল্যকাল থেকে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া। ঘরে ঘরে MTA দেখার ব্যবস্থা করা, ঘরে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করাও আমাদের কাজ। বাল্যকালে ধর্মীয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে হুযূর আকদাস মসীহে মাওউদ (আঃ)-যে উপদেশ দিয়েছেন তা আমাদের সর্বদা মনে রাখা দরকার। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ"। এ প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমি প্রথমে পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলছি, ইসলামের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার পূর্বে এবং এর সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা হওয়ার পূর্বে পার্থিব শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করা অতি ভয়ানক। ছোট্ট শিশুদেরকে ধর্ম সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে অবহিত না করা পর্যন্ত কেবল স্কুলের শিক্ষা দেওয়া হলে, এরূপ কাজ তাদের দেহে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় সংমিশ্রিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাদের ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কি-বা পথ থাকবে। খৃষ্টানদের কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না। কেননা ত্রিত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং একজন মানুষকে খোদা স্বীকার করায় বিশ্বাস কেবল এরূপ অযথা কাজ যে, উহাকে কোন জ্ঞানবান বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সে নাস্তিক হয়ে যাবে। অনেক বিপদ আছে, অতএব আবশ্যক যে প্রথম দিন থেকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দর্শনও পড়ানো হোক। যখন আজকালের শিক্ষা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের উপর সুপ্রভাব বিস্তার করেনি তখন মেয়েদের ব্যাপারে আর কী আশা করা যায়! আমরা তো মহিলাদের শিক্ষার বিরোধী নই বরং আমরা তো মহিলাদের জন্য একটি স্কুলও স্থাপন করেছি। কিন্তু এটা আবশ্যক মনে করি যে, প্রথমে ধৈর্যের দূর্গকে রক্ষা করা হোক যেন বাইরের প্রভাব থেকে এটা রক্ষা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেককে সঠিক পথ তওবা, তাকওয়া ও পবিত্রতার সৌভাগ্য দান করুন" (বদর ২৪শে মে ১৯০৮)।

প্রতিটি ঘরে প্রত্যহ ভোরে নামায পড়ার পর রীতিমত কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবারের সকলকে নিয়ে দরসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মসীহ মাওউদ (আঃ) এর পুস্তক পড়ায় বাচ্চাদের অভ্যস্ত করতে হবে। খলীফায়ে ওয়াক্তের জুমুআর খুতবাটি পরিবারের সবাই শুনছে বা পড়ছে কিনা সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যেন ঘরে গালি গালাজের প্রচলন না রাখি। আমরা মা বোনেরা ঘরে ইসলামী রীতিনীতি ও শিষ্টাচারের একটি পরিবেশ যেন সৃষ্টি করি। পর্দার ব্যাপারে যেন নিজেরা সজাগ থাকি। বাচ্চাদের নির্লজ্জ হওয়ার ব্যাপারে আমরা মা বোনেরাই দায়ী। ঘরে সালামের প্রচলন করতে হবে। বাচ্চাদেরকে শিখাতে হবে কেউ কিছু উপহার দিলে জাযাকুমুল্লাহ বলা, আনন্দের সংবাদে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা, খারাপ কিছু দেখলে বা শুনলে নাউযুবিল্লাহ্ বলা, এগুলো শুধু মুখস্থ করালেই চলবে না বরং বাচ্চাদের স্বভাবে পরিণত করে দিতে হবে। MTA-তে যে সমস্ত প্রোগ্রাম হয় সেগুলোর প্রতি বাচ্চাদেরকে আসক্ত করতে হবে। যেমন–নযম, উর্দূ ক্লাস, ওয়াকফে নও বাচ্চাদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর অনুষ্ঠানগুলো বাচ্চাদের দেখাতে হবে। বর্তমান টিভি চ্যানেলগুলোর অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য সময় করে তাদের অবশ্যই M.T.A দেখানোর জন্য বসাতে হবে এবং নিজেরা দেখতে হবে, আর একবার যদি আমরা হুযূর (আইঃ) এর কথায় তাদেরকে মজা পাইয়ে দিতে পারি তাহলে মনে হয় অন্য কোন চ্যানেল থেকে তারা এর চেয়ে বেশি মজা পাবে না। এ ব্যাপারে আমরা যদি (লাজনা সংগঠন) বিভিন্ন পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সফলকাম হবো। বর্তমান সমাজে যে অবক্ষয়ের ঢল নেমেছে তার প্রধানতম কারণ সন্তান-

সন্ততির প্রতি আমাদের সুদৃষ্টির অভাব এবং তাদের সামনে আদর্শ দেখানোর ব্যর্থতা। সন্তান-সন্ততি বড়ই নেয়ামত। এদেরকে যদি আমরা যথাসময়ে কদর করতে না পারি তবে পরবর্তিতে অবশ্যই আমাদের আফসোস করতে হবে। আমাদের সুদৃষ্টি ও আন্তরিক দোয়া ছেলেমেয়েদের জীবন সার্থক করতে পারে।

হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) তাঁর 'আদর্শ জননী' পুস্তকে আহমদী মায়েদের নিকট আকুল আবেদন রেখেছেন। তিনি (রাঃ) বলেন, "হে আহমদী মায়েরা তোমাদের উপর এক গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তোমাদের জাতির ঐ কচি চারা গাছ যা আজকের শিশু, কালকের যুবক, আজকের পুত্র কালকের পিতা, আজকের অনুসারী কালকের দিশারী, আজকের শাসিত কালকের শাসক। অচিরেই তাদের হাতে কাজের গুরুভার ন্যস্ত হবে তাই নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হও। বাচ্চাদের জীবন এমন একটি ছাঁচে ঢেলে দাও যেন তাদের পালা এলে তারা ঐশী নির্দেশের উপর উজ্জ্বল তারকার মত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সম্ভবত তোমরা তোমাদের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত নও কিন্তু তোমাদের প্রভু এবং খোদার প্রিয় বান্দা (সাঃ) তোমাদের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত এবং তোমাদেরকে নিজের প্রিয় অস্তিত্বের তুল্য মর্যাদা দান করেছেন। তাই এই মহা কল্যাণের মর্যাদা দান করো এবং প্রিয় খোদার প্রিয়জন হও। ঐ দায়িত্ব পালন কর যা খোদা তোমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছেন। এটা বড়ই গুরু দায়িত্ব কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস রাখো যে এই রাস্তায় প্রতিটি পদক্ষেপে খোদা তাআলার ফযল এবং রহমতের ছায়া তোমাদের মাথার উপরে থাকবে। তাঁর পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর পবিত্র দোয়া সমূহ তোমাদের সাথী হবে। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রভু খোদা, হে আমাদের আকাশের প্রভু! দূর্বলকে শক্তিদানকারী খোদা, তুমি আহমদী মায়েদের হৃদয়ের মধ্যে এই প্রেরণা সৃষ্টি করে দাও যেন তারা প্রথম পর্যায়ের সাহাবীদের ন্যায় নিজ সন্তানদেরকে তোমার এক পবিত্র আমানত মনে করে তাদের তালীম ও তরবিয়তকে এমন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যা তোমার সন্তুষ্টি ও ইসলাম এবং আহমদীয়াতের উন্নতির কারণ হয়। আহমদী শিশুদেরকেও সেই সৌভাগ্য দান করো যেন তারা নিজ পূণ্যবতী মায়েদের তরবিয়তের কার্যক্রমকে পূণ্যাত্মা ও সুবোধ বাচ্চাদের মত গ্রহণ করে। এই দোয়া যেন সকল আহমদী পিতা-মাতার মুখে থাকে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের স্ত্রীগণকে এবং সন্তানদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানোর উপকরণ করে দাও এবং আমাদেরকে খোদা ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বংশধর দান করো আর হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদেরকে ঐ সকল কল্যাণসমূহ দান করো যে সম্বন্ধে তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে অপদস্ত ও অপমান হওয়া থেকে রক্ষা করো। তুমি নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি পালনকারী পরম দয়ালু প্রভু'।"

পরিশেষে যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র কালাম থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, তিনি (আঃ) বলেন, "সন্তান সন্ততিকে মেহমান মনে করা উচিত, তাদেরকে খাতির যত্ন আত্তি করা উচিত ও তাদের মনস্তুষ্টি করা উচিত। তবে খোদা তাআলার উপরে কাউকেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। সন্তান দিয়ে কী হয়! প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলার সন্তুষ্টিই কাম্য (আল হাকাম ২৪শে ডিসেম্বর ১৯০৮)।

মহান খোদা তাআলা আমদের সন্তান-সন্ততিদেরকে উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন। আমীন!

-মিসেস মিসামাতুন নেসা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ভর্তির বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ক) ভর্তির আবেদন ফরম প্রেরণের সময়সীমা বর্ধিতকরণ

সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক ফল প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ভর্তির জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে আগ্রহী নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক এস. এস. সি ও এইচ. এস. সি পরীক্ষায় যারা ন্যূনতম ই গ্রেড পেয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছ থেকে নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহ করে যথা শীঘ্র অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বরাবর প্রেরণ করুন।

প্রত্যেক জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব-কে এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

খ) ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঃ

২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির আবেদনকারীদের ভর্তি পরীক্ষা (লিখিত মৌখিক সাক্ষাৎকার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি) আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০০৭ তারিখগুলোতে অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদেরকে ২২ অক্টোবর ২০০৭ তারিখ সন্ধ্যার মধ্যে দারুত তবলীগ ৪নং বকশী বাজার রোডে উপস্থিত হতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত আবেদন ফরম সংগ্রহে বিলম্ব ঘটে থাকলে যোগ্য প্রার্থীরা (S.S.C ও H.S.C-তে নূন্যতম B গ্রেড প্রাপ্তরা) ভর্তি পরীক্ষার দিনেও স্ব-স্ব জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে যথারীতি তা পূরণ করে নির্ধারিত তারিখে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সুরভিত এক ফুল
মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রাহেঃ)

চতুর্থ কিস্তি)

তখন তবলীগ বীর বঙ্গীয় আমীর সাহেবের তবলীগে শহরের শিমরাইলকান্দি ও কান্দিপাড়ার আশি জন নারী পুরুষ এক সাথে বয়াত করে জামাতে আহমদীয়ায় দাখিল হন। এ বয়াত অনুষ্ঠানটি হয়েছিল শিমরাইল কান্দির আব্দুল হক সাহেব (জনাব শহীদুর রহমান প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পিতা) এর নিজ বাড়ীতে। তাদের অধিকাংশই বড় মাওলানা সাহেবের পূর্বের মুরীদান ছিলেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা তাদের যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জ্ঞান সকলের পক্ষে তখন অর্জিত না হলেও বড় মৌলানা সাহেব সত্যবাদী এবং তিনি কখনও কাউকে ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করেন না এ অগাধ বিশ্বাসের উপরই তাঁরা বয়াত করে ফেলেন। ফলে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথিক হন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–**এরাই ঐসব লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয় এবং এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত** (২ ঃ১৫৮)। অতঃপর শহরে বিরাট প্রভাব পরে। আহমদীদের জনবল বৃদ্ধি পায়। তিতাস নদীর পাড়ে রূহানীয়তের সাগরে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ দুই পাড়ার আহমদীদের পরিচিতি কল্পে এর নামকরণ হয় 'আহমদী পাড়া'। শতবর্ষ ধরে এ আহমদী পাড়া আজও তার ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বর্তমান কর্মকান্ড এখানেই প্রতিষ্ঠিত।

১৯১৮ সালের দিকে ক্রোড়া জামাতের উদ্যোগে এক তবলীগি জলসার আয়োজন করা হয়। এতে বঙ্গীয় আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের আমন্ত্রণে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের বাইর থেকেও সোনার বাংলার অনেক সোনার মানুষ ঐশী প্রেমিকেরা যোগদান করেন। তাঁরা হলেন–হযরত রইছ উদ্দিন খাঁ (রাঃ) সাহাবী, প্রফেসার আব্দুল লতিফ বঙ্গীয় আমীর দ্বিতীয়, খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী, বঙ্গীয় আমীর চতুর্থ। খান সাহেব মোবারক আলী বঙ্গীয় আমীর পঞ্চম এবং তাঁর ছোট ভাই বেলায়েত উদ্দিন, কাছেম উদ্দিন আহমদ উকিল, দেবগ্রামের উকিল দৌলত আহমদ খা মুন্সি এবং পুনিয়াউটের মাওলানা এমদাদ আলী চৌধুরী প্রমুখ। উক্ত জলসায় বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মালু খলীফা নামে এক প্রসিদ্ধ লাঠি খেলোয়াড় নিকটবর্তী রমু মিয়ার বাড়িতে লাঠি খেলার আয়োজন করে। ঢোল বাজিয়ে খেলা শুরু করলে তাকে শত অনুরোধের পরও খেলা বন্ধ করেনি। তবে ঐশী জামাতের জলসা বাধা বিপত্তির মাঝেই সুসম্পন্ন করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার মোজেজায় কদিন পরই মালু খলীফা পানিতে ডোবে লাঠি খেলার অঙ্গভঙ্গিতে মারা যায়। ফলে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আহমদীয়াতের সত্যতার প্রভাব পরে।

১৯১৯ সালে 'দারুল খেলাফত' কাদিয়ান থেকে হযরত ইব্রাহীম বাকাপুরী (রাঃ) এর শুভাগমন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তখন শহরের অদূরে ভাদুঘর গ্রামে এক তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আগত অতিথি এবং বঙ্গীয় আমীর সাহেবের ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা জামাতে আহমদীয়ার সত্যতার প্রতি আবেগাপ্লুত হন। ফলে অনুষ্ঠানেই ৮/১০ জন নারী-পুরুষ বয়াত গ্রহণে সৌভাগ্য লাভ করেন। তাছাড়া বঙ্গীয় আমীর সাহেব হযরত বাকাপুরী (রাঃ)কে নিয়ে তারুয়া, সরাইল সহ বিভিন্ন জামাত সফর করে তবলীগি অনুষ্ঠান করেছেন। এমনি ভাবে অসংখ্য প্রাণবন্ত, সার্থক ও সফল ঐশী জামাতের কর্মকান্ডে বঙ্গীয় আমীর সাহেবের জীবন বর্নাধ্য হয়ে আছে। ফলে এ সাধক পুরুষের হাতে ১৯১৩ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ১০১৬ জন বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে আরো অনেকে বয়াত করেছেন। কিন্তু জীবনের পরন্ত বেলায় অসুস্থ্য তার কারণে তাদের নাম রেকর্ড করা তাঁর সম্ভব হয়নি। তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণকারীর সংখ্যা একশত হলেই তিনি তাদের নামের তালিকা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল ও সানী (রাঃ) খেদমতে প্রেরণ করতেন। এবং তা তখনকার আল ফযল আল বদর ও আল হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯১৬ সালে এমারত প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন স্থানে বয়াতগ্রহণকারী বৃদ্ধির সূচনালগ্নে স্থানীয় জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন এর প্রধানকে ইমাম বলা হতো। বিভিন্ন স্থানে সেই ইমাম নিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জামাতের প্রশাসনিক কাঠামোতে জামাত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বঙ্গীয় আমীরের আধীনে প্রাথমিক অবস্থায় নিয়োজিত সেই প্রয়াত ইমামগণ হলেন ঃ

১। শিমরাইল কান্দি (পূর্ব)–মুন্সি মকরম আলী।

২। কান্দিপাড়া (উত্তর)–আব্দুল আজিজ দপ্তরী, ব্রহ্মণবাড়িয়া জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কফিল উদ্দিনের শ্বশুর।

৩। কান্দিপাড়া (মধ্য)–মৌলভী আওসাফ আলী উকিল।

৪। শিমরাইল কান্দি (দক্ষিণ)–মুন্সী সাদত আলী, আব্দুল আলিমের পিতা।

৫। কাউতলী–কারী মোজাফফর আলী।

৬। ভাদুঘর (পূর্ব)–মৌলভী আজিজ উদ্দিন মিয়া। বঙ্গীয় মোয়াল্লেম।

৭। ভাদুঘর (পশ্চিম)–আব্দুল গনি।

৮। মৌড়াইল (দক্ষিণ)–মীর আব্দুস সাত্তার–শেখ আব্দুল আলী পোষ্ট মাষ্টারের শ্বশুড়।

৯। মৌড়াইল–মুন্সী সাবের আলী চৌধুরী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টের নাযের ছিলেন।

১০। পুনিয়াউট–মৌলভী এমদাদ আলী চৌধুরী, ১৯১২ সালে মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সাথে কাদিয়ান গমনকারী।

১১। সদাঘড় পাড়া–মুন্সী আব্দুল বারি।

১২। চটকী পাড়া-মুন্সী আনসার আলী।

১৩। পৈরতলা–মনসুর আলী।

১৪। দাতিয়ারা–সুরুজ মিয়া।

১৫। নাটাই (উত্তর) রফিকউল্লাহ্ সিকদার।

১৬। নাটাই (দক্ষিণ)–আইন উদ্দিন।

১৭। ঘাটুরা–কফিল উদ্দিন।

১৮। গুহিলপুর–সামছুল আলী।

১৯। হরিনাদি–কমরউদ্দিন।

২০। সরাইল– মীর সেকান্দর আলী, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলীর দাদা।

২১। দেউড়া সাবাজপুর–আজার উদ্দিন মিয়া, আতিকুল ইসলামের পিতা।

২২। থলিয়ারা–আফসারউদ্দিন ভূঞা।

২৩। গোকর্নঘাট–হাজী জাহি বকশ।

২৪। গোকর্ণঘাট–মুন্সী আশরাফ আলী।

২৫। তারুয়া–দেওয়ান উদ্দিন মুন্সী, ১৯১৬-৩৭ তারুয়া জমাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

২৬। বিদেশ্বর-আব্দুল হাকিম।

২৭। কাছাইট–কারী নঈম উদ্দিন, আল্লামা জিল্লুর রহমান সদর মুরব্বীর পিতা।

২৮। কাইতলা–হাজী আব্দুল করিম।

২৯। বিষ্ণুপুর–মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন আহমদ মাষ্টার।

৩০। বাশারুক–মৌলভী রহমত আলী মোজাহেদে মালকানা।

৩১। ক্রোড়া (কুড়াবাড়ি)–আফসারউদ্দিন ভূঞা, সাদেক আহমদ ভূঞার পিতা।

৩২। ক্রোড়া–(পশ্চিম) আব্দুল গফুর।

৩৩। ক্রোড়া (পূর্ব) জয়নউদ্দিন।

৩৪। বাসুদেব–সিরাজুল ইসলাম ভূঞা। কামরুল ইসলাম ভূঞার দাদা।

৩৫। খড়মপুর–এরশাদ আলী খাদেম। আফজাল আহমদ খাদেম আহমদীদয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার আমীর-এর দাদা।

৩৬। দেবগ্রাম–জয়নাল হোসেন খাঁ।

৩৭। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাজার–মীর আব্দুস সাত্তার।

৩৮। ঢাকা-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হোসাম উদ্দিন হায়দার।

৩৯। চট্টগ্রাম–প্রফেসার আব্দুল লতিফ, বঙ্গীয় দ্বিতীয় আমীর।

৪০। বীর পাইকসা–মোহাম্মদ আজিজুদ্দিন মাষ্টার বি,এ।

৪১। নাগের গাঁও–সৈয়দ মুজাবেহীন।

৪২। শিলাগুড়ি–আব্দুল সোবহান, পুলিশ ইন্সেপেক্টর।

৪৩। দিগদাইড় (বগুড়া) আরজউদ্দিন মৌলভী মোবারক আলী বঙ্গীয় পঞ্চম আমীরের পিতা।

৪৪। ভরতপুর (মুর্শিদাবাদ) হাফেজ তৈয়বউল্লাহ্।

৪৫। রামপুর বোয়ালিয়া (রাজশাহী) মুন্সী মহিউদ্দিন এবং

৪৬। ময়মনসিংহ–বজলুর রহমান (গভঃটেলিগ্রাফিষ্ট)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) খেলাফতের প্রারম্ভে কাদিয়ানের জলসা সালানায় প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণে মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের তবলিগী কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। উক্ত ভাষণটি 'মানসাবে খেলাফত' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে উল্লেখিত হয় যে, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদকে ওয়ায়েজ হিসাবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখনও তিনি সে এলাকায় তবলীগ কার্যে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁর কয়েক দিনের তবলিগী রিপোর্ট হতে প্রকাশ যে সেখানে খোদার ফযলে ও রহমতে বয়াত করে ২৩ ব্যক্তি আহমদীয়া সিলসিলাভুক্ত হয়েছেন। মাওলানা সাহেব একজন একান্ত 'ওয়াজিবুল এহতেরাম' এবং মুত্তাকী বুযুর্গ বটে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দীনি খেদমতে আশীষ বর্ষণ করুন এবং তাঁর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে রওনক দান করুন। আমীন (মানসাবে খেলাফত শেষ টাইটেল পেইজ)। প্রকৃতপক্ষে যুগ খলীফার (রাঃ) প্রশংসায় তাঁর জীবনালেখ্য অনেক সমৃদ্ধ ও ধন্য হয়। (চলবে)

–মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

সতর্ক হওয়ার সময় কি এখনও আসে নাই!

দশের বেশির ভাগ অঞ্চলেই ভয়াবহ বন্যায় মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেশের লাখ লাখ পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। খাদ্য ও পানীয় জলের সংকট তীব্র আকার ধারন করেছে। ইতিমধ্যে সরকারী হিসাবে ১২০ জনেরও বেশী মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, ৩৮টি জেলা, ২৩৪টি উপজেলা, এক হাজার ৬০৭ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা বন্যা কবলিত হয়েছে। প্রায় ছয় লাখ ঘরবাড়ি আংশিক ও ৯০ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর বেসরকারী হিসাবে ৪৭টি জেলা বর্তমান বন্যা কবলিত। বন্যার ফলে মানুষের আয় রোজগার বন্ধ। ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের বিস্তার ঘটছে। বন্যা কবলিত অনেক এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বন্যাদূর্গত এলাকাগুলোর সাথে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। গ্রামের ছোট খাট বাজার, দোকান, ব্যবসা-বাণিজ্য বলা চলে একেবারে অচল হয়ে গেছে। সর্বত্র আজ হাহাকার অবস্থা বিরাজ করছে।

লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন জেলায় বন্যা হয়। সেই বন্যা কোন বছরে কম ক্ষতি করে আর কোন বৎসর ব্যাপক ক্ষতি করে। কিন্তু কয়েক বছর পর আবার বড় ধরনের বন্যা আমাদের সমগ্র জাতিকে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি ও মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। এছাড়া ঘূর্নিঝড় জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের জন্য পুরোপুরি স্থায়ী সংকট ও দুর্ভোগের কারণ হয়ে আছে। এসব ক্ষয়ক্ষতি আমাদের আর্থসামাজিক জীবনে তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী উভয় ধরনের প্রভাব ফেলে। আর এ ধরনের বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তা দিয়েই বন্যাদূর্গতদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

মানুষ মানুষের জন্য, আর সকল ধর্মই কল্যাণের জন্য। বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ কোন্ সম্প্রদায়ের বা কোন্ ধর্মের তা এই দুর্যোগের সময় দেখার বিষয় না। দেখার বিষয় হল সে একজন মানুষ। সেও সেই মহান খোদারই সৃষ্টি। তাই আমাদের সকলের উচিত দলমত নির্বিশেষে বন্যা কবলিত লোকদের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের একটু সহযোগিতার ফলে একটি পরিবার আগামী দিনের আলো দেখার স্বপ্ন দেখতে পারে। যিনি ডাক্তার তিনি পারেন তার সেবার হাত প্রসারিত করতে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বান্দার হক আদায় করতে হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি নিজ ধন-সম্পদের মাধ্যমে ধর্মের সেবাও করে থাকে, দেশ ও জাতির সেবাও করে থাকে, মানবতারও সেবা করে থাকে সেক্ষেত্রে মনে করে নাও তোমরা নিজেদের প্রভুর কাছ থেকে উত্তম জিনিস লাভ করে নিয়েছো। আর এমন সব জিনিস লাভ করে নিয়েছো, মরার পরেও সেগুলো তোমাদের কাজে আসবে। এ গুণই যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে সৃষ্টি করে দাও তাহলে পরে কেবল দুনিয়া তোমাদেরই প্রশংসা করবে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্যেও দোয়া করতে থাকবে। তোমাদের জন্যেও দোয়া করবে আর তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যেও দোয়া করবে। আর এতে পুণ্যে তোমাদের প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। তোমাদের আখেরাত আরও সজ্জিত হতে থাকবে। তাই এ বোধ ও প্রচেষ্টা প্রত্যেক মু'মিনের থাকা আবশ্যক" (জুমুআর খুতবা ৭ই মে, ২০০৪)। তাই যুগ খলীফার নির্দেশ মত আমাদের সকলের উচিত আর্তমানবতার সেবায় নিজেদেরকে উত্তম ভাবে পেশ করা।

পৃথিবীতে আজ একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেই চলেছে যেমন, সুনামীর তান্ডবে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ হয়েছে লন্ড-ভন্ড। সুপার পাওয়ার, সুপার টেকনোলজির দেশ আমেরিকা ক্যাটরিনা ঝড়ের মহা প্রলয়ে দিশেহারা। সাহায্যের জন্য সেখানেও মানুষের আকুল আর্তি, হাহাকার। ভূমিকম্পের মহাতান্ডবে বিপর্যস্ত জাপান, ইরান, ভারত, পাকিস্তান। দাবানলে জ্বলছে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিঃস্ব অসহায় আফ্রিকা। এইডসের হিংস্র থাবায় ধুকে ধুকে মরছে সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ। ম্যাডকাউ, মার্স, বার্ডফ্লু, ইত্যাদির আতংকে ভীত-বিহ্বল বিশ্ববাসী। আর প্রতি বছর আমাদের দেশে বন্যায় সব কিছু গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে। বন্যার পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও আবার বন্যার ভয়াবহতা বেড়েছে। নতুন করে দেখা দেয়া বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার। দ্বিতীয় দফার এই বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হবে এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) মতিউর রহমান।

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখবেন কি, এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন এত ব্যাপক রূপ ধারন করছে? কেন এমন হচ্ছে? কেন একের পর এক বিপদ পৃথিবীতে প্রবল হয়ে আসছে? এর উত্তর একটাই আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যথা সময়ে এ জগতে এসেছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ জগদ্বাসীকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু জগত তাঁর (আঃ) ডাক শুনে নাই। আজ হতে প্রায়

এক শতাব্দী পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে বাণী পেয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যথাসময়ে এ যামানার আযাব সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এর অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি ঃ তিনি (আঃ) বলেন, "শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হবে। কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটা এজন্যে হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে এবং মন প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হয়েছে। আমি যদি না আসতাম, তবে এসব বিপদরাশি আসতে কিছুটা বিলম্ব হতো। খোদা তাআলার ক্রোধ বহুদিন যাবত লুক্কায়িত ছিল। আমার আগমনের সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়েছে"।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) আরো বলেন ঃ "অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকবে, বিপদ আসার পূর্বেই যারা ভীত হয় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হবে। তুমি কি মনে করছো যে, এসব ভূমিকম্প হতে তুমি নিরাপদে বেঁচে যাবে? স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? কখনও নয়। মানুষের চেষ্টা সেদিন অচল হবে। মনে করো না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসছে, কিন্তু তোমাদের দেশ নিরাপদে থাকবে। আমিতো দেখছি হয়তো তোমরা তা হতেও গুরুতর বিপদের মুখে পড়বে।"

তিনি (আঃ) আরও সতর্ক করে বলেন,

"হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও, হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাচ্ছি। সেই লা-শরীক খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন, তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি এবার রুদ্র মূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক ঐ সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে, যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয় কীট এবং যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয় মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, ২৫৬-২৫৮পৃঃ)।

জগত জুড়ে সংঘটিত এ আযাবের তান্ডবলীলা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর সতর্ক বাণীর-ই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্র প্রেরিত ব্যক্তিদের না মানলেই তিনি তাঁর রুদ্র মূর্তি প্রকাশ করে এক ভয়ানক আযাবের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি আযাব দিয়ে থাকেন। এ কারণে এ ঐশী ক্রোধ থেকে মুক্তির পথ এবং উত্তরণের মাধ্যম হচ্ছে যুগ ইমামকে মেনে নিয়ে ঐশী খেলাফতের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া। তাই আমরা জগদ্বাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি যুগ ইমামকে মেনে নিয়ে অনুতাপকারী হয়ে নিজেরাও হেফাযতে থাকুন আর সমগ্র জগতকেও হেফাযতে রাখুন। সমগ্র পৃথিবীর এই সব দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য চাই ঐশী নেতৃত্ব। বর্তমান বিশ্বের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে যুগ খলীফা গত ২৪/০৮/০৭ হল্যান্ডের বায়তুন নূর মসজিদে জুমুআর খুতবায় বলেন, "গত ১০০ বছরের পরিসংখ্যান নিন। আর আগের ১১/১২ শত বছরের আসমানী দৈব দুর্যোগের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন, এ ১০০ বছর এ ক্ষেত্রে কত এগিয়ে রয়েছে। গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন-দৈব দুর্যোগ কিভাবে আমাদেরকে বার বার ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক আহমদীর উচিত, নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে, জগতকে সতর্ক করা। যেন জগত আযাব থেকে বেঁচে যায়। শুধু মাত্র এ বছর বিশ্বব্যাপী যেসব (দৈব দুর্যোগ) ঘূর্নিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প হয়েছে এর একটা তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এ বছর ফেব্রুয়ারীতে ইন্দোনেশিয়াতে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার লোক গৃহহীন হয়েছে। সেখানে দুটি ভূমিকম্প হয়েছে। রেকটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬.৪ ও ৬.৩। পরে সুমাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জেও ভূমিকম্প হয়েছে। এতে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির ফলে পাকিস্তানের করাচিতে বন্যা হয়েছে। হাজার হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যাপক প্রাণহানীও ঘটেছে। বেলুচিস্তানে বন্যায় ২৫ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৬ হাজার গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জুনে বাংলাদেশেও ঝড় ও সাইক্লোনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জুলাই-এ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বন্যা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রায় অর্ধেক বন্যায় ডুবে গেছে। জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বন্যা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াতে ঝড় হয়েছে। তাতে প্রধান প্রধান হাইওয়েগুলো ডুবে গেছে। হুযূর (আইঃ) বলেন এসব দেখে আমাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। খোদাকে চিনা প্রয়োজন"।

দেশবাসীর বুঝা উচিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন এত ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন প্রতি বছর বন্যায় আমাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। আর যাই হোক আমাদের সবার উচিত যুগ ইমামকে মেনে তার খেলাফতের ছায়ায় চলে আসা। আমরা যদি সবাই ঐশী খেলাফতের আওতায় চলে আসি এবং তাঁর কাছে এইসব দুর্যোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করি তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাযত করবেন।

যাই হোক বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানো। সকলের উচিত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। মহান আল্লাহ্ তাআলা বন্যাদূর্গত বিধ্বস্ত জনপদগুলোকে রক্ষা করুন, দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিন এই দোয়াই করি। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগ শনাক্ত করার এবং যুগ খলীফার নেতৃত্বের অধীনে আশ্রয় নেয়ার তৌফীক দান করুন, আমীন।

–মাহমুদ আহমদ সুমন

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

যাকাতের ধন সম্পদ

যাকাতের ধন-সম্পদ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। গুপ্ত ধন-সম্পদ ও বাহ্যিক ধন-সম্পদ। গুপ্ত ধন-সম্পদ নগদ অর্থ, সোনা-রূপা যে আকারেই হোক না কেন, অলংকারাদি হোক বা ব্যবহৃত আর কোন জিনিস।

(ক) বাহ্যিক ধন-সম্পদ ঃ গবাদি পশু। যেমন উট, গাভী, মোষ, ভেরা, ছাগল জাতীয় পশু। শর্ত এই যে, বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত বা এজমালী গ্রাম্য স্থানে চরে খায় আর এদেরকে বেঁধে রীতিমত খাবার দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

(খ) জমিতে উৎপন্ন ফলাদি। যেমন , গম, যব, জোয়ার , ধান-চাল, বজরা, খেজুর, আঙ্গুর, বনের মধু যা কেউ সংগ্রহ করেছে।

(গ) যেসব ধাতব পদার্থ ব্যক্তির নিকট মজুদ আছে যেমন, লোহার খনি, তামার খনি, টিনের খনি, তেলের খনি প্রভৃতি।

(ঘ) ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যবহৃত সম্পদ ঃ শিল্প কারখানার ব্যবহৃত পূঁজি।

(ঙ) বাহ্যিক ধন-সম্পদ থেকে আসলে যাকাত সংগ্রহ করার অধিকার সরকারের। এর কারণে যে, যেসব জমি থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করে বা যেসব শিল্প-কারখানার প্রতি ইনকামট্যাক্স (আয়কর) আরোপ করে এর ওপর অতিরিক্ত যাকাত নেই; কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্র ছাড়া যেখানে সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার থেকে কম।এক্ষেত্রে যে পার্থক্য এর হিসেবে নিজ থেকে অথবা সরকারের দাবী অনুযায়ী সানন্দে যাকাত আদায় করা কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ আর পুণ্যেরও কারণ।

(চ) গুপ্ত ধন-সম্পদের তদারকি সরকারের পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেভাবে জমাকৃত নগদ অর্থ মূল্যবান অলংকারাদি, বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর পদ্মরাগ, জমরূদ (এক প্রকারের মূল্যবান সবুজ পাথর)। এসব সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করা একজন সত্যিকারের মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। এ যাকাত গরীব মিসকিন অভাবী ব্যক্তিদেরকে স্বয়ং নিজের ইচ্ছায় দিতে পারে আর ধর্মীয় আঞ্জুমান ইশাআতে ইসলামের জন্য কেন্দ্রীয় অফিসাদির মাধ্যমেও বন্টন করা যেতে পারে। অধিকতর উত্তম ও প্রত্যেক দিক থেকে কল্যাণকর পদ্ধতি এই, এ ধরনের সবটা যাকাত যেন যুগ-খলীফার কাছে পাঠানো হয় যাতে গোটা জামাতের গরীব মিসকীন ও অভাবীদের এ সম্পদ থেকে অংশ লাভ হয়। কারণ এটাই, উম্মতের সব আলেম এ নিয়মকে স্বীকার করেছেন। যাকাত বন্টন করা যুগ-ইমামের অধিকার (তশরীহে যাকাত, পৃষ্ঠা ১৩৬)।

যাকাতের আবশ্যক শর্তাবলী ঃ

জমি থেকে উৎপন্ন ফসলাদি যেমন, বিভিন্ন প্রকারের শস্য, খেজুর, আঙ্গুর, মধু, এদের বেলায় তখন যাকাত অবশ্য দেয় হয় যখন এগুলো পাকার উপযুক্ত হয় আর এর নিসাব পূর্ণ হয়। এরপর এ উৎপন্ন দ্রব্য যত বছরই পড়ে থাকুক না কেন এর ওপর যাকাত প্রবর্তিত হবে না।

অন্য রকমের সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, সোনা, রূপা, ব্যবসায়ের মালামাল, গবাদি পশু এগুলোর ওপরে যাকাত তখন অবশ্য-কর্তব্য হবে যখন তা নির্ধারিত নিসাব-এর সমান হয় আর সারা বছর অধীনে থাকে। যত বছর অধীনে থাকবে প্রত্যেক বছর এগুলোর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে। গবাদি পশুর জন্যে একটি বিশেষ শর্ত এটাও। এরা বাইরে সরকারী চারণ ক্ষেত্র, জঙ্গল এবং গ্রাম্য চারণ ক্ষেত্রে চরে আর এর ওপর তাদের জীবন নির্বাহ হয়, তাদের স্বয়ং খাবার দিতে হয় না। তদুপরি ওগুলো হালে জোতার এবং বোঝা বহনের কাজেও লাগে না।

গবাদি পশুর যাকাত প্রকৃতপক্ষে এমন দেশ ও এলাকার সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে বিস্তীর্ণ চারণ ক্ষেত্র সহজে পাওয়া যায়। সেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ ভেড়া-বকরী ও গাভী পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন ও দুধ বা মাংস রপ্তনী করা হয়ে থাকে অথবা কোন প্রকারের অন্যান্য ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পেশা হিসেবে পশু পালন করা হয়ে থাকে।

যাকাতের নিসাব ও নিয়মাবলী ঃ

নগদ অর্থ, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য সব রকমের মূলধনের জন্যে নিসাবের নিরিখ হলো রূপা অর্থাৎ যার নিকট ৫২ তোলা ৬ মাসা অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে বা এত রূপা বা সোনা থাকে যা দিয়ে এ পরিমাণ রূপা কেনা যায় তখন এর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। যাকাতের বিষয় হলো পুরো মূলধনের চলি-শ ভাগের এক ভাগ বা আড়াই (২.৫%)শতাংশ যেমন, ৫২ তোলা ৬ মাসা রূপার মূল্য যদি ১০,৫০০ টাকা হয় আর এত অর্থ তার নিকট থাকে তাহলে ২.৫% হিসেবে নিশ্চিত তাকে১৬২.৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

এটা সেই সম্পদের যাকাত যার জন্যে নিসাবের নিরিখ রূপা আর নিসাবের নিরিখ জানার জন্যে ওজন হলো মাধ্যম।

মহিলাদের বক্তিগত ব্যবহারে থাকে এমন সোনা ও রূপার অলংকারাদির বেলায় এবং কখনও কখনও চাওয়ার পরে তারা গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয় এর ওপরে যাকাত হবে না। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন, 'যে অলংকার ব্যবহারে রয়েছে এর যাকাত নেই।' আর রেখে দেয়া হয় এবং কখনও কখনও পরা হয় এর যাকাত দেয়া আবশ্যক। যে অলংকার পরা হয় আর কখনও কখনও দরিদ্র মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, কোন কোন লোকের এ ব্যাপারে ফতওয়া এই যে, এর যাকাত নেই। আর যে অলংকার পরা হয়

এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়া ভাল। কেননা, এ নিজের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের ঘরে এর ওপর ও নিজেদের বর্তমান অলংকারের ওপর যাকাত দেয়া হয় আর যে অলংকার টাকা পয়সার মত রাখা হয় এর যাকাত দেয়ার প্রসঙ্গে কারও মতভেদ নেই" (মযমুআ ফাতাওয়া আহমদীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭, আল্ হাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৫)।

ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ওপর যাকাত আদায় করার আসল অধিকারী যদিও সরকার আর নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে তারা ট্যাক্সের পরিমাণও নির্ধারণ করেন। তবুও দিক-নির্দেশনার জন্যে উম্মতের আলেমগণ মূলধনের ওপর যাকাত নির্ধারণের যে নীতি প্রস্তাব করেছেন এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলে অপকার হবে না।

শিল্প-বাণিজ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে কেবল সেই মূলধনের ওপর যাকাত প্রদেয় যা ব্যবসায়ের আবর্তনে রয়েছে অর্থাৎ মালামাল আনতে ও মালামাল বিক্রি করতে ও মালামাল তৈরী করতে হয়। যে পুঁজি বিনিয়োগকৃত কারখানার মেশিনারী, দালান-কোঠা, প্রয়োজনীয় অফিসাদি, ফার্নিচার ও হিসাব কিতাবের রেজিষ্টার বই খাতা এবং ফাইল ইত্যাদিতে ব্যয় হয়েছে এর ওপর যাকাত প্রদেয় হবে না। এভাবে বাস, ট্রাক, টেক্সি ও ভাড়া দেয়ার নিমিত্তে নির্মাণকৃত দোকান-পাট ও ঘর-বাড়ী নির্মাণের ব্যয়কৃত মূলধনও যাকাত থেকে রেয়ায়েত হবে। এমনিভাবে এসব জিনিষ যা মানুষের আসল প্রয়োজন মিটাতে ব্যয় হয় যেমন থাকার বাড়ী, পরার কাপড়-চোপড়, ঘরের আসবাবপত্র, ফার্নিচার, আসা-যাওয়ার গাড়ী, লাইব্রেরীর পুস্তক ইত্যাদি-এর যতই মূল্য হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ টাকারই হোক না কেন এর ওপরও যাকাত প্রদেয় হবে না।

মোটকথা যাকাত চলমান ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের প্রতি। যাকাতের হিসাব এভাবে হতে পারে। যত টাকা যে যে মাসে ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয় তত টাকা সেই সেই মাসে উলে-খ করে সবটা একত্র করে নেয়া হয় আর ১২ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা বের হয় এর চলি-শ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দিতে হয়। যেমন, ২৫০.০০ টাকা বছরের প্রথম ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ পর্যন্ত বার মাস ঘটলো। ২ মাস পরে ২০ টাকা আরও বিনিয়োগ করা হলো যা ১০ মাস ব্যবসায় ঘাটলো। এর ২ মাস পরে ৫০০.০০ টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হলো যা বছরের শেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে হিসাব করা হয় ২৫০.০০ টাকা ১২ মাস, ২০.০০ টাকা ১০ মাস, ৫০০.০০ টাকা ৮ মাস খাটানো হয়েছে। এজন্যে

টাকা	মাস	মোট
২৫০ x	১২	= ৩,০০০
২০ x	১০	= ২০০
৫০০ x	৮	= ৪,০০০
		=৭,২০০/-

সমস্ত বিনিয়োগকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,২০০/= টাকা। একে ১২ দিয়ে ভাগ করলে ৭,২০০/=১২=৬০০/=। এর চলি-শ ভাগের এক ভাগ ১৫/= যাকাত ধার্য হবে। (পুণঃমুদ্রিত)

কৃতী ছাত্র/ছাত্রী

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে আমাদের বড় ছেলে কাওসার আহমেদ গত এইচ, এস, সি (২০০৭ইং) পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান কলেজ (টাঙ্গাইল) হতে বিজ্ঞান বিভাগে GPA-5 (A+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। সে অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি এবং এস, এস সিতেও GPA-5 (A+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ই"ছুক। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন তাকে উ"চ শিক্ষা লাভ করার এবং জামাতের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ সামসুল ইসলাম
(মোয়াল্লেম)

আমার প্রথম কন্যা মিস আফিফা পারভীন (শান্তা) এবার ২০০৭ইং এইচ, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখা থেকে জি.পি.এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে এস,এস, সি পরীক্ষায়ও জি.পি.এ-৫ পেয়েছিল। উল্লেখ্য যে সে (শান্তা) বি, বাড়িয়া জামাতের মরহুম শহিদুর রহমান সাহেবের দৌহিত্রী এবং সদর মুরব্বী মৌলানা বশিরুর রহমান সাহেবের ভাতিজী। সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে আগ্রহী। তার ভবিষ্যত লক্ষ্য অর্জনে সফলতা, দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

আনিসুর রহমান খোকন
ঢাকা জামাত

জামাত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

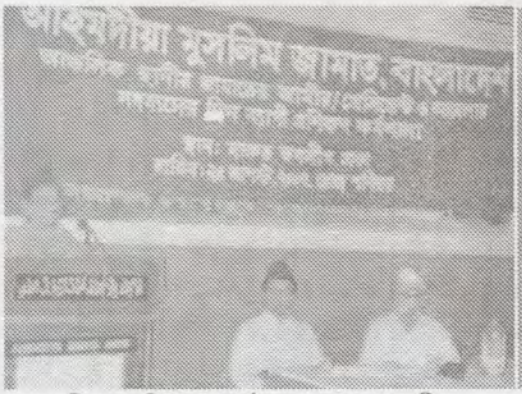

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঢাকা কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাবৃন্দ বিশদভাবে কর্মপদ্ধতি বুঝাচ্ছেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তা বৃন্দের অংশগ্রহণ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাদের দিনব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

২০০৭-২০১০ মেয়াদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সকল স্থানীয় জামাতে নির্বাচনের পর ৬টি এ্যামারাত জামাত ও ৬৬ টি প্রেসিডেন্ট জামাতে আমীর/প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাদের অনুমোদন দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ২০০৭-২০০৮ সালের শুরুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর নির্দেশে মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের হেদায়েত ও অনুমোদনক্রমে ৯৬ টি জামাতকে ১৫ টি অঞ্চলে বিভক্ত করে আঞ্চলিক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয় ঃ গত ২০/০৭/০৭ইং তারিখ হতে ০৭/০৯/২০০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রায় দু'মাস ব্যাপী এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। অঞ্চলগুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) তেবাড়ীয়ায় ৯টি জামাত, (খ) রংপুরে ৮টি জামাত (গ) হেলাঞ্চাকুড়িতে ৫টি জামাত (ঘ) কুকুয়ায় ৬টি জামাত (ঙ) কুমিল্লায় ৭টি জামাত (চ) বগুড়ায় ২টি জামাত (ছ) রঘুনাথপুরবাঁকে ৬টি জামাত (জ) নাসেরাবাদে ৭টি জামাত (ঝ) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৫টি জামাত (ঞ) বানিয়াজানে ৬টি জামাত (ট) আহমদনগরে ৩টি জামাত (ঠ) ময়মন-সিংহে-৩টি জামাত (ড) ঢাকায় ১০টি জামাত (ঢ) পাগুলিয়ায় ৭টি জামাত (ণ) তেরগাতীতে ৪টি জামাতের অংশগ্রহণে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

কেন্দ্র থেকে ন্যাশনাল আমীর স্বয়ং ১টি অঞ্চলে এবং বাংলাদেশ জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ফাইনান্স, সেক্রটারী উমুরে আমা, সেক্রেটারী তবলীগ, সেক্রেটারী তরবীয়ত, সেক্রেটারী তা'লিম, এডিশনাল সেক্রেটারী ফাইনান্স, এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মুবাইনসহ সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীদের ৩/৪ সদস্য বিশিষ্ট কয়েকটি টিম বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্মশালায় উপস্থিত থেকে সকল অঞ্চলের জন্য অভিন্ন কর্মসূচী অনুযায়ী কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালায় 'স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য', নতুন করে প্রকাশিত পুস্তিকা বিতরণ করে কেন্দ্রের আরো কিছু করণীয় বর্জনীয় লিফলেট অর্থ দফতরের চাঁদা আদায়, কেন্দ্রে প্রেরণ, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কেন্দ্রের সাধারণ দফতরের সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীবৃন্দ এবং অর্থ দফতরের সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীগণ উপস্থিত থেকে সকল স্থানীয় জামাতগুলিকে প্রশিক্ষণ দিতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। যাযাকুমুল্লাহ্।

এবারের জামাতী কর্মশালায় প্রত্যেক অঞ্চলে কর্মকর্তাগণের নিজেদের ভুলত্রুটি, ভাল মন্দ সব কিছুই খোলাখুলি আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মকর্তা ব্যক্তিগত মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছেন। প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব কি, দূর্বলতা সীমাবদ্ধতাগুলো নিজেরাই খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। কর্মশালায় সবার সামনে নিজ নিজ অবস্থা ব্যাখ্যা করার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি আলোচনা-পর্যালোচনায় অন্যরকম পরিবেশ তৈরী হওয়ায় ভুলত্রুটিগুলো চিহ্নিত হয়েছে। কার কি দায়িত্ব, কি ভুল সেটা সরাসরি আলোচনা করা হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে ভুলত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠার পথ তৈরী হয়েছে। যার যোগফল হতে পারে চমৎকার টিম ওয়ার্ক ও টিম স্পিরিট। আর টিম ওয়ার্ক করার জন্য কর্মশালায় যোগদানকারী জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাদের অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরী উপাদান হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর ঘাটতি থাকলে জামাতের কার্যক্রমে গতি ব্যাহত হবে আর নিজেদের কার্যক্রমে খিলাফতের প্রত্যাশা

পূরণে অভাব দেখা দিবে। ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে।

প্রত্যেক অঞ্চলে যোগদানকারী জামাতের কর্মকর্তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে এবং এখন থেকে নিয়মিতভাবে স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক/মনিটরবৃন্দ এবং কেন্দ্র সকল স্থানীয় জামাতগুলির কার্যক্রম সরাসরি মনিটরিং করবে।

হুযূর (আইঃ) যেভাবে বলেছেন **"সব মরিচা ঝেড়ে ফেলে নবোদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন"**। ইনশাআল্লাহ্, আমরা চেষ্টা করছি সকল জামাতকে সচল করে জামাতের সাংগঠনিক ও আর্থিক বিষয়ে সচেতন করে পূর্বের চেয়ে আরো গতিশীল করে তুলতে।

এজন্য স্থানীয় জামাতের আমীর/ প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাদের কর্মশালায় আলোচিত বিষয়গুলির উপর যথাযথভাবে দৃষ্টি দিয়ে জামাতের কাজে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলের সহযোগিতায় আমরা যেন হুযূর (আইঃ) এর খেদমতে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠিয়ে সকলেই তাঁর (আইঃ) দোয়ায় শামিল হতে পারি। সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
জেনারেল সেক্রেটারী

রমযান মাস উপলক্ষ্যে সার্বিক তরবিয়তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ

রমযান মাস উপলক্ষ্যে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি রমযানের মোবারকবাদ। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সদয় অনুমোদনক্রমে আসন্ন রমযান মাস উপলক্ষে স্থানীয় জামাতসমূহের আমীর ও প্রেসিডেন্টগনের খেদমতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ঃ

১। প্রত্যেক জামাতের কেন্দ্রীয় মসজিদে/ হালকা মসজিদে বা নামাযের জন্য নির্ধারিত জায়গায়, নিয়মিত বা-জামাত ওয়াক্তিয়া নামায, তারাবীহ্ নামায ও দরসে কুরআনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

২। মসজিদ বা নির্ধারিত নামাযের স্থান যাদের বাড়ী থেকে দূরে তারা নিজেদের বাড়ীতেই পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে আন্তরিক হোন।

৩। প্রত্যেকেই যেন কুরআন তেলাওয়াত (সম্ভব হলে অর্থ সহ) ও নিয়মিত নামাযে তাহাজ্জুদের প্রতি সচেষ্ট হন। চেষ্টা করুন আসন্ন রমযানে সবাই যেন অন্ততঃ একবার কুরআন মজীদ (তেলাওয়াত) খতম করেন। সে বিষয়ে উদ্যোগ নিন এবং নিয়মিত নিগরানী করুন।

৪। জামাতের যেসব সদস্য/সদস্যা কুরআন নাযেরা জানেন না তাদের জন্য আসন্ন রমযান মাসে কুরআন শিক্ষার বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

৫। ২০ রমযানের মধ্যে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায় করুন। যাতে হুযূর আনওয়ার (আইঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য নামের তালিকা পাঠানো যায়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাকে উপরোক্ত চাঁদায় শামিল করুন। যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তারাও যেন সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকের নামে চাঁদা আদায় করেন।

৬। রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফের ব্যবস্থা করুন। এছাড়াও এ বরকতময় মাসে মসজিদ সর্বদা ইবাদত ও যিকরে ইলাহীতে ভরপুর রাখুন।

৭। যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর শহরের জামাতের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং গ্রামের জামাতের জন্য ফিদিয়ার হার নূন্যতম ৭০০/- (সাত শত) টাকা। যারা সামর্থবান তারা রোযা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

৮। এ বছর ফিতরানা ধার্য্য হয়েছে ৬০/- (ষাট) টাকা। যারা অস্বচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করবেন।

৯। এম,টি,এ-তে হুযূর আনওয়ার (আইঃ)-এর খুতবা জুমআ এবং কুরআনের দরস শোনার ব্যবস্থা করুন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো জামাতের সর্বস্তরের সদস্য/সদস্যাদের অবগত ও স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে হালকা পর্যায়ে সাধারণ সভার আয়োজন করুন এবং রোযার শেষে এসব কার্যক্রমের একটি বাস্তবায়ন রিপোর্ট মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর প্রেরণ করুন।

–কাওসার আলী মোল্লা, সেক্রেটারী
তরবীয়ত,
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

দৃষ্টি আকর্ষণ

পবিত্র মাহে রমযানে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা ওয়াদা অনুযায়ী আদায় করে হুযূর (আইঃ)-এর বরকতপূর্ণ দোয়া লাভ করুন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তাহরীকে জাদীদের চলতি বৎসরের আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে। অথচ জামাতের অধিকাংশ লোক উক্ত তাহরীকে ওয়াদা করেন নাই। এবং ওয়াদাকারীগণের উশুলিও সন্তোষজনক নয়। সকলকে এই মুবারক তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। একজন শিশুও যেন বাদ না পড়ে।

রমযান অতিবাহিত হচ্ছে। উল্লেখ্য ২৫শে রমযানের পূর্বে সম্পূর্ণ ওয়াদাকৃত চাঁদা পরিশোধকারীগণের নামের লিষ্ট হুযূর (আইঃ) এর খেদমতে দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। এ বিষয়ে সকল স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। আপনার জামাতে মোট সদস্য কত? ওয়াদাকারী কত? অবশ্যই জানাবেন। ওয়াদাকারীগণের থেকে চাঁদা আদায় করে পূর্ণাঙ্গ লিষ্ট পাঠিয়ে হুযূরের খেদমতে দোয়ার জন্য পাঠাতে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, সেক্রেটারী
তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

খুলনা জামাতের মজলিসে আমেলার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ আগষ্ট, ২০০৭ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯-০০টা হতে বেলা ১২-১৫মিনিট পর্যন্ত হুযূর (আইঃ) কর্তৃক ২০০৭-১০ সনের জন্য অনুমোদিত মজলিসে আমেলার সদস্যদের নিয়ে এক কর্মশালা বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালাটি পরিচালনা করেন স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। কর্মশালার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত জনাব মুহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। অতঃপর আমীর জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন। মুবাশ্বের মুরুব্বী মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ জামাতের কর্মকর্তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে সে মোতাবেক নিষ্ঠার সাথে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়।

স্থানীয় আমীর ও সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কর্তব্য শীর্ষক পুস্তিকা এবং 'তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিধিবিধান' শীর্ষক পুস্তকে বর্ণিত স্থানীয় আমীর মজলিসে আমেলার সেক্রেটারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পাঠ করা হয় এবং তার উপর বিশদ আলোচানান্তে সকল সেক্রটারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং সে মোতাবেক নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নসিহত করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রায় সকল সেক্রেটারীগন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ তারুয়া ৯ম বার্ষিক ইজতেমা '০৭ সম্পন্ন

গত ৩১শে আগষ্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর ০৭ইং তারুয়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ৯ম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উদ্বোধনী অধিবেশন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিজান মিয়া। তারপর আহাদ পাঠ ও দোয়ার পর নযম পাঠ করেন জনাব এনায়েতুল ইসলাম। সভাপতি সাহেব ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আনসারের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন, জনাব শফিউল আলম বরকত, রিজিঃ নাযেম, তারপর উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ হতে ৭টা পর্যন্ত এমটি-এতে খুতবা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু হয়। সিলেবাস মোতাবেক তেলাওয়াত, বক্তৃতা, দ্বীনি মালুমাত মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার নামায ফযর ও দরসে কুরআনের পর উপস্থিত আমেলা সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সদর সাহেব সাংগঠনিক এক সভা করেন। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশনে বিকাল ২-৩০মিঃ আরম্ভ হয়। জনাব এ, বি, এম শফিউল আলম বরকত সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন প্রতিযোগিদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকারী জনাব জামাল সিরাজী ও জনাব এনায়েতুল হাসান। আনসারদের উদ্দেশ্যে কুরআনের আলোকে নছিহত মূলক বক্তব্য রাখেন মৌঃ মোজাফফর আহমদ, মোয়াল্লেম তারুয়া। আনসারদের দায়িত্ব অপরিসীম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোশারফ হোসেন। সহঃ রিজিঃ নাযেম সাহেব। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। শেষে আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় সর্বমোট ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার ১৩ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৩, ২৪ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার ১৩তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা ২০০৭ইং উদযাপর করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

২৩ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয় খাকসারের সভাপতিত্বে। অনুষ্ঠানে শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ্ এবং নযম পাঠ করেন এস, এম, নঈমউল্লাহ। আহাদ পাঠ, দোয়া ও খাকসারের উদ্বোধনী ভাষণের পর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। 'অংগসংগঠন জামাতের কাজকে গতিশীল করতে সহায়ক' বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মুসামিয়া। আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব ও

কর্তব্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব শেখ মোশাররফ হোসেন।

২৪ আগষ্ট রোজ শুক্রবার। নামায ফযর ও দরসে কুরআনের পর সুস্থ্য থাকুন ব্যায়াম প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। চা বিরতির পর পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনাব মুসা মিয়া স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। মজলিসের পতাকা উত্তোলন ও আহাদ পাঠ এবং দোয়া করান জনাব শেখ মোশারফ হোসেন। সহঃ রিজিওনাল নাযেম।

ইজতেমায় প্রতিযোগিতার মধ্যে, কুরআন তেলাওয়াত, নযম বক্তৃতা, দীনি মালুমাত, মৌখিক কুইজ, পয়গামে রেসানী সহ বিভিন্ন খেলাধূলা নেয়া হয়। আকর্ষণীয় একটি স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন, বিকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি মোহতরম কাওসার আলী মোল্লা, নায়েব সদর সফে আওয়াল সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল কাশেম। নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম নঈম উল্লাহ। আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন মৌলভী আছাদুউল্লাহ আছাদ মোয়াল্লেম ঘাটুরা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি।

ইজতেমায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও আহাদ পাঠের পর সভাপতি সাহেব এর দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ইজতেমায় স্থানীয় আনসার ২০জন, খোদ্দাম ৮ জন, আতফাল ৫ জন, কেন্দ্রীয় মেহমান ১ জন, রিজিওনের ২ জন, সর্বমোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

–শফিউল আলম বরকত,
রিজিওনাল নাযেম

বৃহত্তর খুলনা জেলা মজলিস
আনসারুল্লাহ্‌র দুইদিন ব্যাপী ৭ম বার্ষিক ইজতেমা ২০০৭ অনুষ্ঠিত

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর নায়েব সদর আউয়াল, জনাব কাওসার আলী মোল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে ১৭ আগষ্ট, ২০০৭ তারিখ বাদ জুমআ দুইদিন ব্যাপী ৭ম বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধনী কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ এর কায়েদ মাল জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, খুলনা জামাতের আমীর ও জেলা নাযেম জনাব আব্দুর রাজ্জাক এবং মুবাশ্বের মুরুব্বী মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ সাহেব উপস্থিত থেকে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম দ্বীনি মালুমাত লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, পয়গামে রেসানী ও প্রশ্নোত্তর (কুইজ) প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ আগষ্ট, ২০০৭ তারিখ ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম নায়েব সদর আউয়াল, জনাব কাওসার আলী মোল্লা সাহেব আনসারুল্লাহ সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌গণের দিক নির্দেশনা উল্লেখপূর্বক অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। দুই দিন ব্যাপী এই ৭ম বার্ষিক জেলা ইজতেমায় বৃহত্তর খুলনা জেলার ৫টি মজলিসের মধ্যে ৪টি মজলিস হতে ৩০ জন আনসার সহ প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
জেলা নাযেম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আনসারুল্লাহ্‌র ১৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

৩ ও ৪ আগষ্ট রোজ শুক্রবার ও শনিবার মজলিসে আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোহতরম কাওসার আলী মোল্লা নায়েব সদর সফে আউয়াল সাহেবের সভাপতিত্বে মোহতরম মাহবুব আযম রেজা নাযেব সদর সফে দওম, রিজিওনাল নাযেম, জেলা নাযেম স্থানীয় আমীর মোবাশ্বের মুরব্বী ও উপস্থিত আনসার ভাইদের নিয়া ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল কুরআন তেলাওয়াত নাযেরা, মুখস্ত দীনিমালুমাত লিখিত মৌখিক সাধাবণ জ্ঞানের মৌখিক বক্তৃতা, নযম বাংলা, উর্দু, উপস্থিত বালিশ খেলা, ইন আউট খেলা, মেধা শক্তির পরীক্ষা কুইজ ও পয়গামে রেসানি দলীয় ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি সাহেব আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইজতেমায় ক্রোড়া ঘাটুরা মজলিসের ৩ জন মেহমানসহ মোট আনসার ৬১ জন খাদেম ১০ জন আতফাল ৫জন সহ সর্বমোট উপস্থিত ৭৬ জন।

–যয়ীমে আলা,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস

মাতা-পিতা দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট ও মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া সিলেট এর যৌথ উদ্যোগে মাতা-পিতা দিবস গত ১১/৮/০৭ইং বাদ মাগরিব পালিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু করা হয়। তারপর বিভিন্ন বক্তাগণ মাতা-পিতা দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা রাখেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। এতে সর্বমোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

একামতে সালাত সেমিনার উদযাপিত

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া সিলেট ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেটের যৌথ উদ্যোগে গত ১৭-০৮-০৭ইং বাদ জুমুআ মোহতরম মোহাম্মদ ইকবাল

চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সিলেট-এর সভাপতিত্বে একামতে সালাত সেমিনার উদযাপিত হয়। তারপর সালাত কায়েমের গুরুত্ব তাৎপর্য ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তাগণ আলোচনা করেন। মোহতরম প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আপ্যায়ণের ব্যবস্থা ছিল। সেমিনারে সর্বমোট ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

সোহেল আহমদ
জনারেল সেক্রেটারী

সন্তান লাভ

আমার বড় ছেলে জুবায়ের আহমদ লিপু (জার্মানীর নাগরিক)। গত ০৭/০৯/০৭ইং তারিখে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতিকার নাম রাখা হয়েছে 'নাদিয়া জায়েদা আহমদ'। সকল ভাই বোনের নিকট দোয়ার আবেদন যে, আমার নাতনী ও পুত্র বধূকে মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন সুস্থ্য রাখেন এবং আহমদীয়াতের উত্তম খাদেমা বানান।

জায়েদ আহমদ,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

শুভ বিবাহ

গত ২৮/০১/০৭ মোসাম্মৎ সর্মিলা সুলতানা (রিংকী) পিতা-মরহুম আব্দুল কুদ্দুস গ্রাম-নকালি, পোঃ বাঘাবাড়ি, জেলা-সিরাজগঞ্জ এর সাথে জনাব নাছের আহমদ পিতা-জনাব আহমদ আয়াতুর রহমান ১৩৯৮/৯ রিয়াজবাগ তালতলা, খিলগাঁও ঢাকা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬২০/০৭

গত ০১/০৪/০৭ মোসাম্মৎ আনার কলি (কলি), পিতা-মোহাম্মদ আক্তারুল ইসলাম, চন্দনপাট এর সাথে জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন পিতা-মোহাম্মদ হোসেন, ৬/এ, ১/১১ মিরপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৪৮/০৭

গত ২৩/০৩/০৭ মোসাম্মৎ তাহমিনা আক্তার মিতু পিতা-মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, মিরপুর হালকা, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ ফয়েজ আহমদ (ইরান) পিতা-মৃত আবু হানিফ ৩৫/২ নং বাবুরাইল নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৪৯/০৭

গত ১২/০১/০৭ মোসাম্মৎ নাসিমা আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ সুরুজ মিয়া, গ্রাম ভাদুঘর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে জনাব মহসিন আহমদ হাজারী পিতা মোহাম্মদ আবুল কাশেম হাজারী, ঘাটুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫০/০৭

গত ২৬/০১/০৭ মোসাম্মৎ শারমিন আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ খলিলুর রহমান লস্কর, ঘাটুরা, বি, বাড়িয়া- এর সাথে মোহাম্মদ নঈম আহমদ পিতা-মরহুম সায়েব আলী, মোড়াইল, বি, বাড়িয়া-এর বিবাহ ১০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫১/০৭

গত ১৩/০৪/০৭ মোসাম্মৎ জলি আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ জয়েন উদ্দিন প্রামানিক, তেবাড়িয়া, নাটোর এর সাথে জনাব জাকির আহমদ, পিতা-শহিদ আহমদ, গ্রাম আহমদ নগর, পোঃ ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫২/০৭

গত ১০/০৪/০৭ মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার, পিতা-মোহাম্মদ আবুল কালাম, ৪২/ডি, পশ্চিম তেজতুরি বাজার এর সাথে জনাব খন্দকার তানভীন আহমেদ পিতা-খন্দকার মোফাক্কের উদ্দিন, ১০৩, পূর্ব তেজতুরি বাজার, ঢাকা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৩/০৭

গত ২৩/০৩/০৭ মোসাম্মৎ শাহানা খাতুন (মালা) পিতা-জনাব শামসুর রহমান, রাংটিয়া ঝিনাইগাতি, শেরপুর এর সাথে মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান পিতা-জনাব মজিদুল ইসলাম, পুরুলিয়া এর বিবাহ ৪৫,১০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৪/০৭

গত ২৩/০৩/০৭ মোসাম্মৎ সুমাইয়া ফেরদৌস বিথী, পিতা-মুহাম্মদ আব্দুস সাদেক, গ্রাম কালদিয়ার, পোঃ [illegible]জদিয়ার এর সাথে মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পিতা-মোহাম্মদ ছাব্বির হোসেন, গ্রাম নশিপুর, পোঃ বাগবাড়ী এর বিবাহ ৪০,০০১/- (চল্লিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৫/০৭

গত ২৮/০৩/০৭ মোসাম্মৎ সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা-মরহুম আব্দুল গফুর, শিমরাইল কান্দি, বি, বাড়ীয়া- এর সাথে মোহাম্মদ তাইবুর রহমান, পিতা-মরহুম মাহমুদুর রহমান এর বিবাহ ১০০০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৬/০৭

গত ১২/০৪/০৭ মোসাম্মৎ তাহমিনা আক্তার কচি, পিতা- মোহাম্মদ হানিফ সরকার, মোড়াইল (দক্ষিণ) বি, বাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আলমগীর, পিতা-মোহাম্মদ আরদান মিয়া, দুর্গারামপুর, বিরগাঁও, বি, বাড়িয়া-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৭/০৭

গত ১৯/০৪/০৭ মোসাম্মৎ সামামাতুর রফিক তুলি, পিতা-মাহমুদ হাসান সিরাজী, ৩৪৪৮/সি ওয়াজেদীয়া রোড, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম এর সাথে জনাব মাসুম পিতা-আবুল কাশেম ১/২৪, পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর বিবাহ ২৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৮/০৭

গত ০৩/০৩/০৬ মোসাম্মৎ সুরাইয়া শারমিন, পিতা-মোহাম্মদ রবিউল হক, বাড়ী নং ১২৬, ব্লক ই, রোড নং ৫/চ চক্ষু

হসপিটাল রোড, চুয়াডাঙ্গা-এর সাথে মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ পিতা-মোহাম্মদ আলী আকবর ভুইয়া, গ্রাম তালুকপাড়া, পোঃ বাতাহড়ি, থানা বরুড়া, জেলা-কুমিল্লা-এর বিবাহ ২০০০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৯/০৭

গত ১১/০৩/০৭ মোসাম্মৎ সাবরিনা জাহান পিতা-মোহাম্মদ সাহাজাহান, ২৫৫, ষলোশহর, চশমাহিল রোড, পলিটেকনিকাল পানচালিশ, চিট্টগ্রম এর-সাথে মোহম্মদ এম, এ, রেজা পিতা-মরহুম মির এম, দিন ১২২ ক্লার্ক প্রেস, এলিজাবেথ, এন ৫০৭২০৬ এর বিবাহ ২৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬০/০৭

গত ৩১/১০/০৬ মোসাম্মৎ ফিরোজা সুলতানা অনুপা, পিতা-মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, ৯২ পূর্ব তেজতরী বাজার, তেজগাঁও ঢাকা এর সাথে জনাব শাহিন আহমদ পিতা-কামরুদ্দিন সাদেক, শিমরাইলকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬১/০৭

গত ১৭/০২/০৭ মোসাম্মৎ রেজওয়ানা পারভীন (রিপা) পিতা-এস, এম, সাহেবুর রহমান, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে জনাব রবিউল ইসলাম পিতা-জনাব ফজলে করীম, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬২/০৭

গত ০২/০৪/০৭ মোসাম্মৎ মাকসুদা বেগম, পিতা-আব্দুল মজিদ, ১নং কে, বি ফজলুল কাদের রোড, চকবজার, চট্টগ্রাম এর সাথে জনাব সাইফুল ইসলাম মানিক পিতা-মরহুম ছায়েব আলী, গ্রাম আহমদনগর পোঃ ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৩/০৭

গত ২৩/০৪/০৭ মোসাম্মৎ হারেছা খাতুন পিতা-মরহুম কাশেম আলী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালশিড়ী এর সাথে মোশারফ হোসেন পিতা-জনাব রমজান আলী শালসিড়ী,ফুলতলা, পঞ্চগড় এর বিবাহ ২২,৯৯৫/- (বাইশ হাজার নয়শত পঁচানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৪/০৭

গত ১৩/০৪/০৭ মোসাম্মৎ আবেদা খাতুন পিতা-জনাব আব্বাস আলী খোচাবাড়ী, ঠাকুরগাঁও এর সাথে মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, শালশিড়ী এর বিবাহ ২৫.০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৫/০৭

গত ১১/০৫/০৭ মোসাম্মৎ নাসরিন কুরাইশি পিতা-জনাব কুরাইশি মোহাম্মদ আরিফ তারুয়া, কোরাইশি মাসুদ আহমদ পিতা-কোরাইশি মোহাম্মদ সাদেক ৪১-এ/বি গাবতলী সেকেন্ড কলোনী মাজার রোড মিরপুর ঢাকা এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৬/০৭

গত ১৯/০৪/০৭ মোসাম্মৎ সায়েদাতুন নেছা (ঝুমুর) পিতা ওয়াসিউজ্জামান সরকার, শিমুলিয়া, শিবপুর, নরশিংদী এর সাথে জনাব রাজু মোহাম্মদ খাঁন পিতা-আমীন মোহাম্মদ খাঁন কান্দিপাড়া বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ৫১,০০১/- (একান্ন হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৭/০৭

গত ১৫/০৫/০৭ মোসাম্মৎ আমেনা তৈয়াবা পিতা-আমিনুল করীম ১৫৪, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ এর সাথে জনাব আবুল কালাম সোয়েব পিতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, 147-64 COOL IDGEAVE JAMAICA NY 11435 U.S.A এর বিবাহ $ 7,000.00 (Seven thousend U.S. Doller) সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৮/০৭

গত ১০/০৫/০৭ মোসাম্মাৎ তাহমিনা শারমিন পিতা-মরহুম আসাদ উল্লাহ, ১৯/১ উত্তর আউচপাড়া এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুল আলীম পিতা-মরহুম আব্দুল হক, ৩৭৩/১/বি উত্তর পীরের বাগ এর বিবাহ ১০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৬৯/০৭

শোক সংবাদ

(১) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়ার প্রবীন আহমদী সদস্য মরহুম নবীউল হক গত ১০ আগষ্ট, ২০০৭ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২ঃ২০ মিনিটে বগুড়ার ঠেনঠেনিয়াস্থ তাঁর নিজ বাসভবনের অদুরে সোনালী হাসপাতাল নামক বেসরকারী ক্লিনিকে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর এবং মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন। তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সন পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়ার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা অর্থাৎ এস ডিও (এগ্রিকালচার) ছিলেন। তিনি অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলতেন। বগুড়া জামাতের সদস্যবৃন্দ এ মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং সম্মিলিতভাবে দোয়া করেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মাগফিরাত করুন এবং তাঁকে নিজের সন্তুষ্টির উচ্চস্তরের মকাম দান করুন,আমীন।

–খন্দকার আজমল হক

(২) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জ এর প্রবীন আহমদী জনাব সুলতান মিয়া দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ১০ই আগষ্ট ২০০৭ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ঃ১৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। মরহুম ৪ ছেলে, ৩ মেয়ে এবং নাতি-নাতনি ছাড়াও বহু শুভাকাঙ্খী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার মাগফিরাতের জন্য ও তাঁর পরিবারের সাবরে জামিল লাভের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম

হাতি-শুঁড়ো গাছ ঃ ভেষজ এক উদ্ভিদ

চোখ উঠা রোগে ও মুখের ব্রনে নিশ্চিত ফলপ্রদ ঔষধি।

হাতি-শুড়ো গাছের মূল, কচি ডাল ও পাতার রস নানা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চরকের সমীক্ষায়-শিরোবিরেচনের কষায় তিক্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। ভেষজটি বায়বীয় প্রধান বলে কফ-পিত্তবিকারজনিত রোগে কার্যকরী। সশ্রুতের চিকিৎসা-ধারায় মূলের রস, পাতার রস ক্রিমি ও কুষ্ঠপ্রশমক, বিশেষ করে ব্রণশোধক। লোকায়িত ব্যবহারে নেত্রাভিষ্যন্দ বা 'চোখ ওঠা' রোগের একটি নিশ্চিত ফলপ্রদ ওষুধি।

পরিচিতি ঃ হাতি-শুঁড়ো গাছ দেশের সর্বত্রই জন্মাতে দেখা যায়। ডাঙ্গা জমিতে, রাস্তা ও জঙ্গলের ধারে; এছাড়াও পুরনো সুরকির গাদায় ও আবর্জনাপূর্ণ স্থানে। গাছের পুষ্পদন্ডের গঠন অবিকল হাতী শুঁড়ের ন্যায় বলে চলতি কথায় একে হাতি-শুঁড়োর গাছ বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ গাছটি বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়; যেমন মহারাষ্ট্রে বলা হয় ভূরন্ডী, হিন্দীভাষী অঞ্চলে হাতাজুড়ি, সারিয়ারী তেলেগুতে নাগদন্তী, ওড়িষ্যায় হাতীশুন্ডা, গুজরাটে হাতি-শুতনা, প্রভৃতি। সংস্কৃতে বলা হয় হস্তিশুন্ডী। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক (Botanical) নাম Heliotropium indicum Linn. ফ্যামিলি Boraginaceae, এটি বর্ষজীবি ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এক দেড় ফুট উঁচু হয়। কান্ড ফাঁপা ও বেশ নরম। গাছের প্রায় সব শাখা খাড়া হয়ে থাকে। সাদা ছোট ছোট লোমে গাছের সর্বঙ্গ ঢাকা। পাতা দেখতেও ডিম্বাকৃতি, তবে আগার দিকটা সরু। নিচের দিকে কোন লোম থাকে না। বৃন্তদেশ গোলাকার অথবা হৃৎপিন্ডাকৃতি। পুষ্পদন্ড হাতির শুঁড়ের ন্যায়, সামনের দিকটা বাঁকানো। ফুলের রং সাদা, তবে ইষৎ বেগুনী ছোপ থাকে, আকারও খুব ছোট হয়। বর্ষার পর গাছে ফুল ফুটে এবং পরে ফল (বীজ) ধরে। তবে অন্যান্য ঋতুতেও গাছে ফুল ফুটে ও ফল ধরে, কিন্তু ফুলের সংখ্যা খুবই কম হয়।

রাসায়নিক উপাদান (Chemical compounds) : (a) Alkaloids (b) Saponin (c) Essential oil (d) Fatty acids.

বিভিন্ন রোগে ব্যবহার

১। চোখ ওঠা রোগে ঃ রাতে শুয়ে আছেন, সকালে ওঠে অনুভব করতে লাগলেন যে আপনার চোখ আর আপনার এক্তিয়ারে নেই, মনে হবে চোখে বালি পড়ে চোখ কর্ কর্ করছে আর চোখ-নাক দিয়ে খালি পানি আসছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে এটা একটা অজ্ঞাত ভাইরাস ইনফেকশন (Virus infection), এর অনুপ্রবেশ বন্ধ করা মুশকিল। তাঁরা বলেছেন, রোগটা যখন তখন আসে, আবার নিয়ম করেও আসে, অর্থাৎ বছরের সব সময় আসার সুযোগ খুঁজে, একটু ফাঁক পেলেই আসে; সে ফাঁকটা হলো ঋতুর বিপর্যয় হওয়ার পর। অর্থাৎ গ্রীষ্মে যদি বসন্তের উদয় হয়, কিংবা বসন্তে গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়, এমনি বর্ষায় শরতের অথবা গ্রীষ্মের আগমন হয় তখনই এরোগ দু'চোখে বাসা বাধে। **সশ্রুতে** বলা হয়েছে-চোখের রোগের সংখ্যা ৭৬ রকমের। সে সবের কারণও পৃথক পৃথক, যেমন রৌদ্র লাগলে, ধোঁয়া লাগলে, খুব বমি হলে, নিদ্রা না হলে, এবং ঋতুর বিপর্যয় হলে চোখের রোগের কারণ হয়। যেগুলো আগন্তুক মাত্র সে সব রোগের ভোগকাল ৫-৬ দিন, আর ফল দাঁড়ায় পিত্ত শ্লেষ্মার বিপর্যয়। তাছাড়া সংক্রামক হয়ে দেখা দেয়, কারণ কোন কোন ব্যাধি 'জড়াজড়' কারণেও জন্ম নেয়। যার আধুনিক প্রচলিত নাম ভাইরাস। এদের বৈদিক নাম 'যাতুধানঃ' ; বিশ্বের যে কোন সত্ত্বায় এরা অবস্থান করে এবং দুর্বল ক্ষেত্র পেলেই এরা সক্রিয় হয়ে আক্রমণ করে ; তখন সে আর 'জড়' থাকে না, না থাকে 'অজড়'। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, একসাথে শোওয়া, বসা, একে অন্যের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা বা নিশ্বাস গায়ে লাগা প্রভৃতি কারনে কতগুলো রোগ সংক্রমিত হয়। চোখ ওঠা অর্থাৎ নেত্রাভিষ্যন্দ রোগও তার মধ্যে একটি। অভিষ্যন্দি শব্দের অর্থ হলো 'সর্বতোভাবে স্যন্দন করা' অর্থাৎ ঝর্ ঝর্ করে চোখ দিয়ে পানি পড়া ও চোখ কর্ কর্ করা। এ রোগ হলে চোখ লাল হয়ে যায়, ফুলে যায়।

প্রতিকার ঃ আগেই বলা হয়েছে যে এ রোগটি ভাইরাসঘটিত, অত্যন্ত ছোঁয়াচেও। এর কোন ওষুধ নেই। তবে চোখ দু'টোকে সবসময় পরিষ্কার রাখাই বিধেয়। দিনে বেশ কয়েকবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ঝাঁপটানো অথবা ফিটকিরি পানি দিয়ে ধোওয়া ইত্যাদি ভাল। কিন্তু কোন ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। যদিও বাজারে বেশ কিছু ওষুধ বিক্রি হয়ে থাকে। চোখ ওঠা রোগটি একবার হলে শরীর প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। এ কারণে রোগটি ছোটদের বেশী হয় এবং বড়দের অপেক্ষা অনেক সময় ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে, হাতি-শুঁড়ো গাছের কচি পাতা ও কচি ডাল গরম পানিতে ধুয়ে নিয়ে একটু থেতো করে বা হাতে রগড়ে দু'এক ফোটা রস সকালে ও

বিকেলে–দিনে দুবার করে চোখে প্রয়োগ করলে দু'তিন দিনের মধ্যে ভাল হয়ে যায়। এটা চোখ ওঠা রোগের একটা মূল্যবান ওষুধ, যা ভারতীয় চিকিৎসাধারার অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী ডাইমক সাহেব তাঁর 'ফার্মাকোগ্রাফিয়া অব ইন্ডিকা' গ্রন্থে লিখে গেছেন।

২। ব্রনে ঃ গায়ের চামড়ার তলদেশে রয়েছে সিবাম নামের তৈলগ্রন্থি। ঐ গ্রন্থি থেকে তেল জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়ে ত্বকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং গায়ের ত্বককে মসৃণ, কোমল চিকন রাখে। অনেক সময় বাইরের ধুলোবালি অথবা শরীর থেকে যেসব বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে আসে–তাদের দ্বারা ছিদ্র পথগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তেল জাতীয় পদার্থ নিঃসরণে বিঘ্ন ঘটায়। এমন অবস্থায় জায়গাটা ঈষৎ ফুলে ওঠে। অপরদিকে শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী রক্তে অবস্থিত শ্বেতকনিকারা বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকারী জীবানুদের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য সেখানে এসে জমা হয় এবং তেলগ্রন্থির চারিদিকে জড়ো হয়। সংগ্রাম করতে গিয়ে কিছু কিছু নষ্টও হয়ে যায়। যেগুলো নষ্ট হয়ে যায় তারা পুঁজ সৃষ্টি করে। সেই পুঁজ ধীরে ধীরে জমাট বেধে শক্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থাকে সাধরণতঃ আমরা ব্রণ বলি এবং এটি মুখেই বেশী হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার খেলে ব্রণ হয়ে থাকে। আবার চামড়ার রোগের জন্য ব্রণ হয়ে থাকে।

কৈশোরে ব্রণ অনেকেরই হয়ে থাকে। তার জন্য অবশ্য শরীরের কতকগুলো পরিবর্তনই দায়ী। বড় হলে ব্রণ কমে যায়। এই বয়সে ব্রণ প্রায় অধিকাংশ যুবক-যুবতীর মুখে দেখা যায়। নিজের থেকে ভাল হয়ে গেলেও গালে কালো কালো দাগ পড়ে যায়, মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

প্রতিকার ঃ হাতি-শুঁড়ো গাছের পাতা ও তার কচি ডাল খেতো করে দুপুরে গোসল করতে যাবার ১ ঘন্টা আগে (৪-৫দিন) ব্রণের ওপর প্রলেপ দিতে হয়। এতে ব্রণ সেরে যায় এবং নতুন করে আর ব্রণ হয় না।

৩। বাতের ব্যথা (রিউমেটিক) নিরাময় ঃ এতে ফুলা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, এগুলো সাধারণত: অস্থির সন্ধিস্থলে (গাঁটে) বেশী হয়। এক্ষেত্রে, এড়ন্ড অর্থাৎ রেড়ি তেলের সাথে হাতি-শুঁড়োর পাতার রস বা পাতা বাটা হালকা আঁচে ফুঁটিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই তেল গাঁটে লাগালে ব্যথা নিরাময় হয়।

৪। হাত-পায়ের গাঁট ফুলে গেলে ঃ সাধারণত: কফের বিকারে হঠাৎ ঠান্ডা লেগে হাত পায়ের গাঁট ফুলে যায়। এক্ষেত্রে হাতি-শুঁড়োর পাতা বেটে অল্প গরম করে ঐসব ফুলা স্থানে লাগালে তা কমে যায়। এ রোগটি আঘাতজনিত ব্যাথা ও ফুলাও নিরাময় করে।

৫। বাগীর ফুলোয় ঃ উরু তলপেটের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ কুঁচকীতে যেটা হয় তাকেই বাগী বলা হয়, ডান বা বাম যে কোন দিকেই হতে পারে। সাধারতঃ এটা যৌন সংসর্গের সময় অস্বাভাবিক অবস্থানের জন্য অথবা মেহ বা ঔপসার্গিক মেহ (গনোরিয়া) রোগগ্রস্ত লোকেরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হাতি-শুঁড়োর পাতা বেটে অল্প গরম করে লাগালে ওটা কমে যায়।

৬। বিষাক্ত পোকাড় কামড়ে ঃ যে কোন বিষাক্ত পোকা, বিচ্ছে ও বোলতায় কামড়ালে ৫ গ্রাম হাতি-শুঁড়োর পাতার রস ও সমপরিমাণ রেড়ির তেল মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগালে ওটা কমে যায়।

৭। ক্ষত ও ফোড়ায় ঃ পোকা-মাকড়ের কামড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হলে অথবা ফোড়া ফেটে যাবার পর ঘা শুকিয়ে যাবার জন্য হাতি শুঁড়ো গাছের পাতা ও কচি ডাল থেতো করে তার রস প্রয়োগ করলে ঘা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

৮। পাগলা কুকুরে কামড়ালে ঃ পাগলা কুকুরে কামড়ালে হাতি শুঁড়ো গাছের পাতার রস ১০ গ্রাম পরিমাণ খাওয়ালে কুকুরের কামড়ের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

৯। সন্নিপাত জ্বরে ঃ সমগ্র হাতি শুঁড়ো গাছকে বেটে তার রস ১০ গ্রাম পরিমাণ খেলে সন্নিপাত জ্বর নিরাময় হয়।

১০। শ্লেষ্মা জ্বরে ঃ সর্দিতে বুক ভার ও সাথে জ্বর। এক্ষেত্রে হাতি শুঁড়ো গাছের পাতার রস ২ চা চামচ একটু গরম করে ছেঁকে নিয়ে খাবার ব্যবস্থা দিয়েছেন প্রাচীন বৈদ্যরা, এর দ্বারা সর্দিটা বমি হয়ে বেরিয়ে যায়।

১১। টাইফয়েড জ্বরে ঃ পিপাসা, সাথে মাথা জালাও প্রবল থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ পাতার রস গরম করে ছেঁকে ঐ রস ১০ ফোটা একটু পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। আধঘন্টা অন্তর ২/৩ বার খাওয়ালে এ উপসর্গটা প্রশমিত হয়। তবে ২/৩ বারের বেশী খাওয়ানো উচিত নয়।

১২। ফেরিন্‌জাইটিসে ঃ ফেরিন্‌জাইটিস বা লেরিনজাইটিস হলে প্রত্যহ সকাল বিকালে অর্থাৎ দিনে ২ বার হাতি শুঁড়োর পাতার রস ২ চা চামচ আধকাপ গরম পানিতে মিশিয়ে গারগল করলে তা ভাল হয়; এমন কি গলার মধ্যে ক্ষত ভাব দেখা দিলে সেটাও সেরে যায়। তবে এসবক্ষেত্রে উল্লেখিত চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে ২/৩ চামচ বাসক পাতার রস একটু গরম করে প্রত্যহ একবার করে খেতে পারলে কফের বিকারটা নষ্ট হয়।

১৩। মাড়ির ঘায়ে ঃ সকালে ও রাতে শোবার সময় হাতি-শুঁড়ো গাছের পাতা থেতো করে তার রস মাড়ির ঘায়ে প্রয়োগ করলে তা তাড়াতাড়ি নিরাময় হয়।

১৪। একজিমায় ঃ হাতি-শুঁড়োর পাতার রস একজিমায় লাগালে তা কমে যায়।

গ্রন্থনা ঃ আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ

গ্রন্থনাপঞ্জী ঃ

১। চিরঞ্জীব বনৌষধি, আয়ূর্বেদাচার্য শিবকালি ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা।

২। রোগ আরোগ্যে উপেক্ষিত দেশী গাছ গাছড়া ফল ফুল শেকড় ও গাছের ছাল, শ্রীজরুৎকারু ভট্টাচার্য, বেনীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কোলকাতা।

৩। খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ূ, সুধাংশু পাত্র, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা।

আশ্বিন মাসের কৃষি

প্রিয় পাঠক!

সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আশ্বিন মাসের কৃষি। চলুন জেনে নেই কী কী থাকছে এ পর্বে। প্রথমেই ধান।

ধান

আমন ধানের বাড়ন্ত পর্যায় এখন ধান গাছের বয়স ৪৫-৫০ দিন হলে ইউরিয়ার শেষ কিস্তি উপরিপ্রয়োগ করে দিন। যেসব ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করেছেন সেসব ক্ষেতে গুঁড়া ইউরিয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই। গুঁড়া ইউরিয়ার সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিষ্কার করে নিন এবং সার দেয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখুন।

এ সময় বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিতে পারে। খরায় আমন ধানের ফলন কমে যায়। তাই এ অবস্থা মোকাবেলা করা জরুরি। এ জন্য সম্পূরক সেচ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। ফিতাপাইপ দিয়ে সম্পূরক সেচ দিতে পারেন। মনে রাখবেন সম্পূরক সেচ আমন ধানের ফলনকে বাড়িয়ে দেয়।

এ সময় ধানক্ষেতে রোগ-পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সতর্কতার সাথে, রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেতে ডাল বা কঞ্চি পুঁতে পাখী বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেতে ডাল বা কঞ্চি পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা ধরে খাবে। তাছাড়া উপকারী পোকা ও প্রাণী যেমন–ড্যামসেল ফ্লাই, ড্রাগন ফ্লাই, টাইগার বিটল, গুইসাপ, ব্যাঙ এসব সংরক্ষণ করতে হবে।

হাতজাল দিয়েও পোকা ধরা যায়। রোগ পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেই কেবল অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে এবং সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন। নিচু এলাকায় এখন আমন ধানের চারা রোপন করা যাবে। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত স্থানীয় উন্নত জাতের শাইল ধানের চারা রোপন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতি গুছিতে ৫-৭টি চারা রোপন করুন। দেরিতে চারা রোপনের জন্য কিছুটা বেশি বয়সের চারা লাগাতে হবে এবং ইউরিয়া সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে।

আখ

আখের চারা উৎপাদন করার উপযুক্ত সময় এখন। সাধারণত বীজতলা পদ্ধতি এবং পলিব্যাগ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা যায়। তবে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হলে বীজ আখ কম লাগে এবং চারার মৃত্যুহার কম হয়। এ ছাড়া পলিব্যাগের চারা বাড়ির আঙিনায় সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তর করা যায়। চারার বয়স ১-২ দুই মাস হলে মূল জমিতে রোপন করুন।

বিনা চাষে ফসল

জমি থেকে পানি নেমে গেলে বিনা চাষে বিভিন্ন ফসলের বীজ বপন করা যায়। পলিপড়া জমিতে ভুট্টা, গম, সরিষা, মাসকলাই, মুগ বুনে দিন। এতে কম খরচে দ্রুত ফসল পাবেন।

সবজির চারা উৎপাদন

শীতকালে সবজি উৎপাদনের জন্য কিছু কিছু সবজির চারা উৎপাদন করতে হয়। বীজতলার চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে জমি নির্বাচন করুন। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং জমিতে আলো-বাতাস লাগে এমন জায়গায় বীজতলা তৈরী করুন। বীজতলার জন্য জমিতে ভালো করে চাষ দিন এবং চাষের সময় প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ১০ কেজি জৈব সার ও ৩০০ গ্রাম টিএসপি মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে দিন। জমি তৈরির পর এক মিটার চওড়া করে এবং জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে লম্বা করে বেড তৈরি করুন। দুটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা রাখুন। এ ফাঁকা স্থানের মাটি কোদাল দিয়ে দু'বেডে উঠিয়ে দিন। এক্ষেত্রে নালার গভীরতা হবে ১৫ সেন্টিমিটার। বীজতলা তৈরি হয়ে গেলে বীজ বপন করুন। মাটির এক থেকে দেড় সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বপন করতে হয়। প্রতি বর্গমিটার জায়গার জন্য ফুলকপির বীজ ৪০-৫০ গ্রাম, বাঁধাকপির বীজ ৫০-৬০ গ্রাম, বেগুনের বীজ ৮০-১০০ গ্রাম, টম্যাটোর বীজ ৮০-১০০ গ্রাম প্রয়োজন হয়। বীজ বোনার পর বেডগুলি চাটাই বা পলি শিট দিয়ে ঢেকে রাখুন। চারা গজানোর পর সকালে ও বিকেলে হালকা রোদ লাগার ব্যবস্থা করুন এবং কড়া রোদ যাতে না লাগে সেদিকে খেয়াল করুন।

শাকসবজির চাষ

শীতের সবজি উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন করুন। পরে জমি ভালো করে চাষ দিন। চাষের সময় পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিন। এ সময় বিভিন্ন ধরনের শাক যেমন–মূলা, লালশাক, পালংশাক, চিনাশাক, সরিষা শাকের বীজ বপন করতে পারেন। তাছাড়া, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, টম্যাটো, বেগুনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে পারেন। এ ছাড়া শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়ার বীজ/চারা রোপণ করুন। সবজি ক্ষেতে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। নিয়মিত সেচ দিন, আগাছা পরিষ্কার করুন এবং রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করুন।

কলা

সারা বছর কলা চাষ করা যায়। তবে আশ্বিন মাস কলার চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ভালো উৎস বা বিশ্বস্ত চাষির কাছ থেকে কলার চারা সংগ্রহ করুন। অমৃত, সাগর, মেহের সাগর, সবরি, কবরি জাতের কলার চারা দুই থেকে আড়াই মিটার দূরে দূরে রোপণ করুন। চারা রোপণের জন্য ৬০ সেমি. গভীর এবং ৬০ সেমি. চওড়া গর্ত করুন। প্রতি গর্তের মাটির সঙ্গে ৫-৭ কেজি গোবর, ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, ১২৫

টিএসপি, ১২৫ গ্রাম এমওপি, ৫০০ গ্রাম খৈল এবং ৫ গ্রাম বরিক এসিড ভালোভাবে মেশাতে হবে। সার মেশানোর ৫-৭ দিন পর কলার চারা রোপণ করুন। কলা বাগানে সাথী ফসলের চাষ করলে লাভ পাওয়া যায় বেশি। সাথী ফসল হিসেবে এ সময় বিভিন্ন রকম দ্রুত বর্ধনশীল শাকসবজির চাষ করতে পারেন।

বৃক্ষ রোপণ

গাছের চারা রোপণের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে রোপণ করা চারা কোনো কারণে মরে গেলে সেখানে নতুন চারা রোপণের উদ্যোগ নিন। রোপণ করা চারার যত্ন নিতে হবে এখন। যেমন বড় হয়ে যাওয়া চারার সঙ্গে বাঁধা খুঁটি সরিয়ে দিতে পারেন এবং চারার চারদিকের বেড়া প্রয়োজনে সরিয়ে বড় করে দিতে হবে। মরা বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে দিন। চারা গাছসহ অন্যান্য গাছে সার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এখন। গাছের গোড়ার চারদিকে আগাছা পরিষ্কার করে গোড়ার মাটি ভালো করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। দুপুর বেলা গাছের ছায়া যতটুকু স্থানে পড়ে ঠিক ততটুকু কোপাতে হবে। পরে কোপানো স্থানে জৈব ও রসায়নিক সার ভালো করে মিশিয়ে দিন। গাছের জাত ও বয়সের কারণে সারের মাত্রাও বিভিন্ন হয়।

ইঁদুর নিধন

ইঁদুর ফসলের ক্ষতি সাধন করে। বিশেষ করে আমন ধান-ক্ষেতে ইঁদুরের কারণে ফসলের ক্ষতি কমানোর জন্য এ অভিযানে এককভাবে ইঁদুর দমন না করে সম্মিলিতভাবে ইঁদুর নিধন করুন। ইঁদুর নিধনের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক চাষাবাদ, গর্তে পানি দেয়া, গর্ত খোড়া, আইল ছোট রাখা, গর্তে ধোঁয়া দেয়া, ফাঁদ পাতা, উপকারী প্রাণী যেমন–পেঁচা, গুইসাপ, বিড়াল দ্বারা ইঁদুর দমন বিষটোপ এবং গ্যাস বড়ি ব্যবহার করা। ইঁদুর নিধনের জন্য এসব পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

পশুপাখি

আশ্বিন মাসে গবাদিপশুকে কৃমির ওষুদ খাওয়ানো দরকার। ভুট্টা মাসকলাই, খেসারি বুনো ঘাস উৎপদন করে গবাদিপশুকে খাওয়াতে পারেন। গর্ভবতী গাভীকে, সদ্য ভূমিষ্ঠ বাছুর ও দুধালো গাভীর বিশেষ যত্ন নিন। এ সময় গৃহপালিত পশুপাখির মড়ক দেখা দিতে পারে। তাই গবাদিপশুর তড়কা, গলাফোলা, মুরগির রাণীক্ষেত এবং হাঁস-মুরগির কলেরা রোগের প্রতিষেধক টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তাছাড়া মুরগীর ছোট ছোট বাচ্চার ককসিডিয়া রোগ হতে পারে। এ রোগ সারাতে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

মাছ চাষ

বর্ষায় পুকুরে জন্মানো আগাছা পরিষ্কার করুন এবং পুকুরের পাড় ভালো করে বেঁধে নিন। আপনার পুকুরের মাছকে নিয়মিত পুষ্টিকর সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করুন। এ সময়ে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করুন। তাছাড়া পুকুরে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন এবং রোগ সারাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। এ সময় সরকারী ও বেসরকারী মাছের খামার থেকে জিওল মাছের পোনা সংগ্রহ করে পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

প্রিয় পাঠক,

কৃষি বিষয়ক যে কোনো পরামর্শ জানতে যোগাযোগ করুন আপনার নিকটস্থ কৃষি কর্মীর সাথে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করুন, দেশের কৃষিকে আধুনিক করতে নিজে এগিয়ে আসুন এবং অপরকে উদ্বুদ্ধ করুন। শেষ করছি আশ্বিন মাসের কৃষি।

[কৃষিকথা ঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-২০০৭ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত]

(উপস্থাপনায় জিরাআত বিভাগ)

দৃষ্টি আকর্ষণ

'পাক্ষিক আহমদী' আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র। এ পত্রিকা ধর্মীয় জ্ঞান অনুরাগীদের চাহিদা পূরণ করে।

এটি পবিত্র কুরআন হাদীস ও সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর লিখনীতে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভান্ডার। এতে প্রকাশিত যুগ খলীফা প্রদত্ত জুমআর খুতবা ও সময়োপযোগী নানা বিধ তাহরিক সবাইকে সর্বক্ষণ পথ নির্দেশ করে।

সুপ্রিয় পাঠক! কালের চাহিদা পূরণকারী তথ্যাবলীর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে আপনি এর গ্রাহক হয়েছেন কি? না হয়ে থাকলে অবিলম্বে এর গ্রাহক হোন।

এর গ্রাহক চাঁদা ডাক মাশুল সহ বার্ষিক-

(ক) ১৫০/- একশত পঞ্চাশ টাকা (বাংলাদেশ)

(খ) ৩০০/- তিনশত টাকা (ভারত)

(গ) ইউ. এস. ১০০ ডলার (অন্যান্য দেশে)

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ - মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি

রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি

খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৫২৭৫৩৯

প্রকাশানার
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

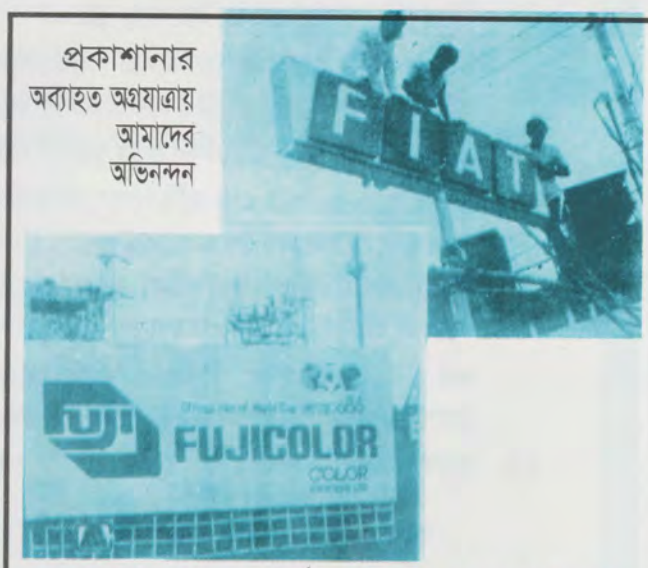

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
এয়ার-রাফি এন্ড কোং
120/32, Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 8350262, 9331306

New Vol. No. 70 ■ 5th-6th Issue 30 September, 2007 ■ Tk. 10.00
Fortnightly **The AHMADI** রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: amgb@bol-online.com